লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ২৫ রবি. আউ., ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৩৯৬ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ ঈসাব্দ

হুকুকুল ইবাদ

প্রচ্ছদ পরিচিতি: দেশ-বিদেশে দুর্গত দুঃস্থদের জন্য হিউম্যানিটি ফার্স্টের খাদ্য, নলকূপের পানি আর স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের আলোকচিত্র। একটি আলোকচিত্রে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় সেবা দিয়ে চলছেন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ আর তাদের উৎসাহ যোগাতে একাংশের সাথে রয়েছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। (টুইটার থেকে সংগৃহীত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

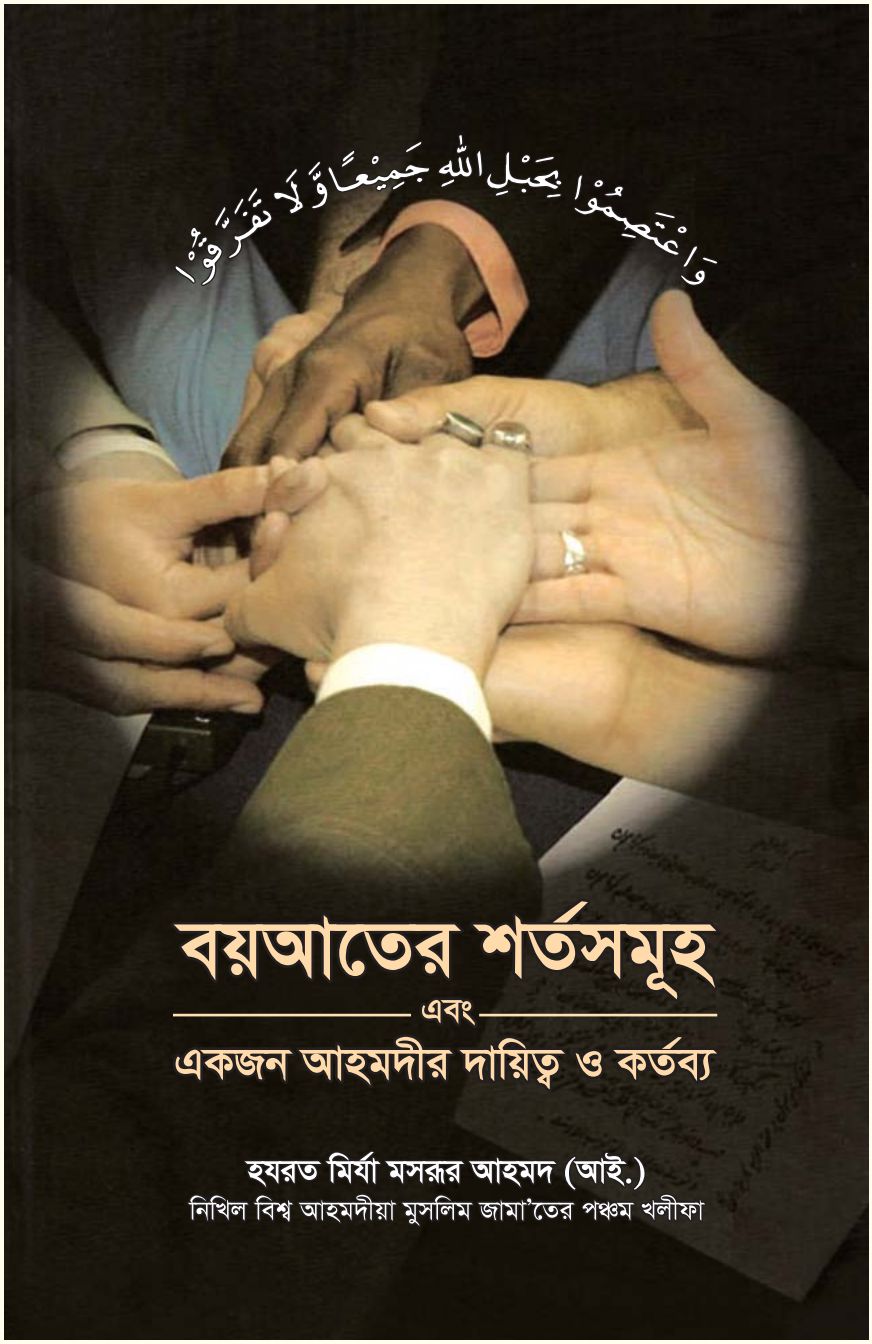

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহ্ তা'লার উৎকর্ষ গুণাবলী প্রকাশে এক মুমিনের করণীয়

ধর্মের উদ্দেশ্য কি? ধর্মের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মুক্তি লাভ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়া; কেননা সত্যিকার অর্থে সেটিই জান্নাত যা পরলোকে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাবে। আর সত্য-খোদা সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং সেই খোদা থেকে প্রকৃতই দূরে থাকা এবং তাঁর প্রতি অবিমিশ্র ভালবাসা না রাখা, এটিই প্রকৃত অর্থে জাহান্নাম যার প্রকাশ পরলোকে বিভিন্নভাবে ঘটবে।

অতএব, এই গূঢ় তত্ত্ব আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ধারাও এই পৃথিবীতেই সূচিত হয় আর জান্নাত লাভও এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায় আর এই উভয়টির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যার পূর্ণ অভিজ্ঞান মানুষ বিভিন্ন অবস্থা এবং রূপে পরকালে লাভ করবে। সত্যিকার অর্থে উপরোক্ত ঈমান থেকে থাকলে, ঈমানের দাবী হলো, ঈমানী অবস্থাকে শোধরানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কোন পাপ হয়েই যায় তাহলে খোদা তা'লার রহমত এবং করুণা সেই পাপকে ঢেকে রাখে। কিন্তু অনেক সময় মানুষ পাপে ধৃষ্ট হয়ে ওঠে আর বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমতের সমুদ্র অতি বিশাল তাই চিন্তার কিছু নেই। এমন মন-মানসিকতা খোদা তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানানোর শামিল। কেননা ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলে মানুষ যখন গযব বা শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হয় আর চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন করা আরম্ভ করে, খোদা তা'লার আদল বা ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তখন স্বীয়রূপ প্রকাশ করে। খোদা তা'লার রহমত সব কিছুকে সার্বজনীনভাবে পরিবেষ্টন করে রাখলেও আদল বা ঐশী বিধান লঙ্ঘনের ফলাফল স্বরূপ অনেক সময় শাস্তি পাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তাসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা করুণাবশতঃ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এই অবস্থা মু'মিনদের সাজে না। প্রকৃত মু'মিনদের অবস্থান এবং মর্যাদাই ভিন্ন।

এজন্য মু'মিনের এটি সাজে না যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার নিয়মকে সে লঙ্ঘন করবে বা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাবে, বিদ্রোহ করবে আর এরপর আহাজারি করবে খোদার করুণা যাচনা করবে, মোটেই এমনটি নয়। বরং এক্ষেত্রে রহমত বা করুণা লাভে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তা'লা যেমন বলেছেন, **ইন্নাল্লাহা রাহ্‌মাতাল্লাহে ক্বারীবুম্ মিনাল মুহসেনীন** অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত মুহসিন বা সৎকর্মশীলদের সাথে আছে।

'মুহসিন' শব্দের অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি যে অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারী, জ্ঞানী, সকল শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাজ সমাপ্তকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, খোদার রহমত রয়েছে তাদের সাথে যারা জেনেশুনে পাপ করে না, সদা শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে। নিজেদের পাপের শাস্তির ভয়ে তারা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে, অন্তরে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতে থাকে। তারা এমন মানুষ, যারা জেনেশুনে পাপ করে না বরং অজান্তে কোন পাপ হয়ে গেলেও তাক্বওয়ার সাথে তারা খোদা তা'লাকে ডাকে। তখন খোদা তা'লার রহমত তাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং তাদের দোয়া গৃহীত হয়।

অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ার আকাঙ্খা থাকলে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক আর মুহসিন শব্দের এ সকল অর্থ সামনে রেখে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক। অতএব এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। সাধারণ বা তুচ্ছ সৎকর্ম করে মানুষ মুহসিন হতে পারে না বরং এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সৎকর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেছেন, মুহসিন হলো সে ব্যক্তি, যে প্রতিটি সৎকর্মের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে সে দেখছে। একথা তার দৃষ্টিতে রাখা চাই বা অন্ততঃপক্ষে এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দেখছেন।

আমাদের ইবাদতের অবস্থাও যদি এমন হয় এবং আমাদের অন্যান্য কাজ করার সময়ও যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে অন্যায় কাজ কখনও হতেই পারে না, আমরা কখনও তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত হতেই পারি না। কখনও কারও সাথে মন্দ আচরণ করতেই পারি না, কারও অধিকার খর্ব কখনও করতেই পারি না, বরং কারও ক্ষতি করা বা অধিকার পদদলিত করার কথা ভাবতেও পারি না। অতএব, ইসলামী শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ তো এমন যে, যেদিক থেকেই এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা আমল করা আরম্ভ করা হোক না কেন বা আল্লাহ্ তা'লার যেই নির্দেশই প্রতিপালিত হোক না কেন বা তাঁর রসূল (সা.)-এর যে কোন উক্তি বা নির্দেশই মান্য করা হোক, তা মানবকুলকে পরিবেষ্টন করে একসাথে যেদিকে নিয়ে যাবে, তা হলো হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান অর্থাৎ সার্বিক অধিকার প্রদান সমুন্নত রাখা।

আমরা আকুল বাসনা রাখি যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, আমরা 'হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ'এর হক আদায় করে খোদার রহমত বা করুণাবারির উত্তরাধিকারী হই, তাঁর করুণাবারি যেন আমাদের ওপর অবারিত ধারায় বর্ষিত হয়। তা অর্জনের সেই মানে উপনীত হতে আমরা যেন প্রচেষ্টারত থাকি, যে মানে একজন মু'মিনের পৌঁছা উচিত। মু'মিন তারা, যার বহিঃপ্রকাশ তাদের ইবাদতের মাধ্যমেও হয় এবং অন্যান্য কর্মের মাধ্যমেও হয় এবং স্থায়ী ইস্তেগফারের মাধ্যমে হয় আর নিজেদের কর্মের ওপর দৃষ্টি রেখে হয়। আর যখন এমন হবে তখন খোদার মাগফিরাত বা ক্ষমা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে, তাঁর রহমতের দ্বার আমাদের জন্য ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত হতে থাকবে। আর এমনটি যখন হবে তখন পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিকও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে দান করতে থাকবেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.)এর আশিসমণ্ডিত ছায়ায় ক্রমোন্নতির সেই সোপানে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুন, আমীন!

সূচিপত্রে

১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৯

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৮

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ২৫
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

ঐশী সাহায্যের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ ২৯
(২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৩৭
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৪০
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

কলমের জিহাদ ৪৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

মুসলিম উম্মাহ্‌র সহমর্মিতায় সহজ-সরল এক নিবেদন ৪৬
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

'আখলাকে আহমদ' অর্থাৎ 'আহমদ'-এর চারিত্রিক গুণাবলী ৪৮
মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান

সংবাদ ৫০

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন–
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿۱۵﴾

১৫। (আর তাকে বলা হবে,) 'নিজের পুস্তক পড়ে দেখ। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿۱۶﴾

১৬। যে হেদায়াত গ্রহণ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে। আর যে বিপথগামী হয় সে তার নিজের অকল্যাণের[১৬০০] জন্যেই বিপথগামী হয়ে থাকে। আর কোন বোঝা বহনকারী[১৬০১] অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। আর আমরা কোন রসূল না পাঠিয়ে কখনো আযাব দেই না[১৬০২]।

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿۱۷﴾

১৭। আর আমরা যখন কোন জনপদকে[১৬০৩] ধ্বংস করতে চাই তখন আমরা এর সচ্ছল লোকদেরকে (তাদের খেয়াল খুশীমত চলার) অনুমতি দেই। তখন এ (জনপদের) ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ প্রযোজ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে সব ধরনের পাপে লিপ্ত থাকে। এরপর আমরা এটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿۱۸﴾

১৮। আর নূহের পর আমরা কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করেছি! আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের পাপের খবরাখবর রাখার ক্ষেত্রে (এবং) পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿۱۹﴾

১৯। যে কেবল ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা করে আমরা (এ ধরনের লোকের মাঝ থেকে) যার জন্য যতটুকু চাই তাকে এ জীবনেই তা শীঘ্র দিয়ে দেই। এরপর তার জন্য আমরা যে জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি এতে সে লাঞ্ছিত (ও) ধিকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

১৬০০। আযাব বা শাস্তি বাইরে থেকে আসে না, বরং মানুষের নিজের অভ্যন্তর থেকেই জন্ম নেয়। জাহান্নামের আযাব এবং জান্নাতের পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে মানবের ইহলোকে নিজের কৃত ভালো ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত মূর্ত প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া। এরূপে মানুষ ইহকালে নিজেই নিজের ভাগ্যের রচয়িতা এবং পরকালে সে স্বয়ং, বলা যেতে পারে, নিজেই নিজের পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা।

১৬০১। প্রত্যেককেই নিজের শাস্তি এবং দুঃখ-দুর্দশা নিজেকেই বহন করতে হবে। কারো বদলিস্বরূপ শাস্তি বা ত্যাগ কারো কোন উপকারে আসবে না। এ আয়াত খ্রিষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।

১৬০২। আমাদের বর্তমান যুগে পৃথিবী একের পর এক পুন: পুন: নজীরবিহীন ভয়াবহ প্লেগ-মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈব দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে চলেছে এবং মানবজীবনকে তিক্ততায় দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসব চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে নেমে আসার পূর্বে আল্লাহ তা'লা নিশ্চয়ই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন।

১৬০৩। 'কারইয়াতান' অর্থ জনপদ, শহর। এখানে 'কারইয়া' মানে নগর জননী বা রাজধানী শহর অর্থাৎ যে শহরকে কেন্দ্র করে জাতীয় কৃষ্টি, রাজনীতি ইত্যাদি অন্যান্য শহরগুলোতে বিস্তার লাভ করে।

হাদীস শরীফ

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতায় মহাকাশে প্রদর্শিত অবিস্মরণীয় নিদর্শন

কুরআনঃ

'এবং চন্দ্র সূর্য উভয়কে (গ্রহণে) একত্র করা হবে' (সূরা ক্বিয়ামা : ১০)।

হাদীসঃ

আমাদের মাহদীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন আছে। আর যখন থেকে খোদা তা'লা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্য প্রদর্শন করেন নি। এর মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, এ রমযান মাসেই সূর্যগ্রহণের তারিখগুলোর (২৭, ২৮ ও ২৯) মধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে গ্রহণ লাগবে।

(সুনানে দারকুতনী, বাবু সিফাতে সালাতিল খুসূফে ওয়াল কুসূফে ওয়া যাহায়াতেহিমা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, মুদ্রাকর আনসারী ছাপাখানা, দিল্লী)

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী (রা.), হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের নামে পরিচিত। তিনি হযরত ইমাম আলী যয়েনুল আবেদীন (রা.)-এর পুত্র এবং হযরত ইমাম হুসায়েন (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন। হাদীস আল্লামা কুরতুবী 'তাযকিরা'তে, আল্লামা জালাল উদ্দিন সাইউতী 'আল হাবী' ও আল্লামা ইবনে হাজর হাশিমী 'আল্ কওলুল মুখতাসির' এ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে কয়েকজন পূর্ববর্তী আলেমও বর্ণনা করেছেন। শিয়া পন্থী আলেমগণেরও এ হাদীস সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছে (তফসীরে সাফী, প্রথম খণ্ড, তেহরান, ফিতার ফোরশী ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-৭৬৫)।

হাদীসের শব্দে আওওয়ালে লায়লাতিন-এর অর্থ এটা হতে পারে না যে, রমযানের প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। কেননা, প্রথম রাত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ লাগতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম রাত্রের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। হাদীসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'কমর' বলে (আল্ মুনজিদ নামক অভিধান দেখুন)।

১। চন্দ্র গ্রহণের নির্ধারিত তারিখগুলোর মধ্যে প্রথম রাত্রে অর্থাৎ ১৩ তারিখ রাত্রে গ্রহণ লাগবে।
২। সূর্য গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখ দিনে গ্রহণ লাগবে।
৩। উভয় গ্রহণই একই রমযান মাসে সংঘটিত হবে।

৪। একজন মাহ্‌দীর দাবীদারের উপস্থিতিতে তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হবে। [বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ-ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রণীত 'তোহ্‌ফা গোলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

জ্যোতির্শাস্ত্র পাঠে এবং গ্রহণের তারিখগুলো দৃষ্টে জানা যায় যে, রমযান মাসে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও এসব নির্ধারিত তারিখে এ ধরনের সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় নি যাতে কোন দাবীকারক স্বীয় সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করেছেন।

এমন ঘটনা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম সংঘটিত হয় যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম মাহ্‌দীর দাবীদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর সে সময় তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন মাহ্‌দীর দাবীদার পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন না। ১৮৯৪ সনের ২৩ মার্চ এ চন্দ্র গ্রহণের এবং ৬ এপ্রিল সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে দেখানো হয় (আযাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৪ এবং মিলিটারী গেজেট, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪ দ্রষ্টব্য)। এসব শর্তানুযায়ী পরবর্তী বছরও রমযান মাসেই দ্বিতীয়বার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আর পশ্চিম গোলার্ধের লোকেরা সেই দৃশ্য অবলোকন করে।

খোদা তা'লা স্বীয় কর্মকান্ড দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন ও নির্ধারিত দিনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে,

১। আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য এবং চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি অদৃশ্যের এমন সংবাদ নিজের পক্ষ হতে তৈরী করে বলতে পারেন না। এটা মহানবী (সা.)-এর সত্যতারও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় দাবীতে নিষ্ঠাবান ও প্রকৃতই সেই মাহ্‌দী, যাঁর সম্বন্ধে হযরত রাসূল করীম (সা.) সংবাদ দিয়েছিলেন। কেননা, কোন মিথ্যা মাহ্‌দী সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগাতে পারে না। মহাকাশীয় বস্তুনিচয়ের ওপর ব্যক্তিবিশেষের কোন হাত নেই।

আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান (মরহুম)

অমৃতবাণী

সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

> শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই আমরা ঐ খোদার প্রতি বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে অংশীদার, যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি।

হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! হে আমার প্রিয় পথ-প্রদর্শক! তুমি আমাকে সে পথ দেখাও, যে পথে নিষ্ঠাবান ও নির্মল হৃদয়ের লোকগণ তোমাকে পেয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে ঐ সকল পথ হতে রক্ষা কর যার লক্ষ্য কেবল কামনা-বাসনা বা বিদ্বেষ, হিংসা বা পার্থিব লোভ-লালসা।

অতঃপর হে শ্রোতাগণ! শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই আমরা ঐ খোদার প্রতি বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে অংশীদার, যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি। এরূপেই আমরা মানুষ নাম ধারণের ক্ষেত্রেও অংশীদার, অর্থাৎ আমাদের সকলকেই মানুষ বলা হয়। তদ্রূপেই একই দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনও আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। তাই নির্মল হৃদয় ও শুভেচ্ছার সাথে আমাদের একে অন্যের বন্ধু হয়ে যাওয়া কর্তব্য। তাছাড়া ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত এবং এরূপ সহানুভূতি দেখানো উচিত, যেন একে অন্যের দেহের অংশ হয়ে যাই।

হে স্বদেশবাসীগণ! সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা আর্যাবর্তের আদিম জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, ঐ সমস্ত শক্তিই আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন ও জাপানের অধিবাসীদেরকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোকেও দেয়া হয়েছে। সকলের জন্য খোদার জমীন বিছানার কাজ করছে। সকলের জন্য তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও আরো অনেক নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ করছে এবং অন্যান্য সেবাও করছে। তাঁর সৃষ্ট জড়-প্রকৃতি, অর্থাৎ বায়ু, পানি, আগুন, মাটি এবং তেমনিভাবেই তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য সকল কিছু যথা শাক-সব্জি, ফল, ঔষধ ইত্যাদি থেকে সকল জাতি উপকৃত হচ্ছে। অতএব আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের এ সকল রীতি এ শিক্ষাই দিচ্ছে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সৌহার্দ্য দেখাই এবং অন-উদার ও সঙ্কীর্ণমনা না হই।

বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানবেন, যদি আমাদের দু'জাতির কোনও জাতি খোদার গুণের সম্মান না করে এবং নিজেদের আচার-আচরণ তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বিপরীত গঠন করে তবে সেই জাতি শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কেবল নেজেরাই ধ্বংস হবে না, বরং নিজেদের বংশধরকেও ধ্বংস করে দেবে। যখন থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে সকল দেশের সাধু পুরুষগণ এ সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন যে, খোদার গুণের অনুসরণকারী হওয়া মানুষের স্থায়িত্বের জন্য এক জীবন সুধা। খোদার সকল পবিত্র গুণের অনুসরণ মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে জড়িত। এটাই শান্তির উৎস।

(পয়গামে সুলেহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫-৬)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

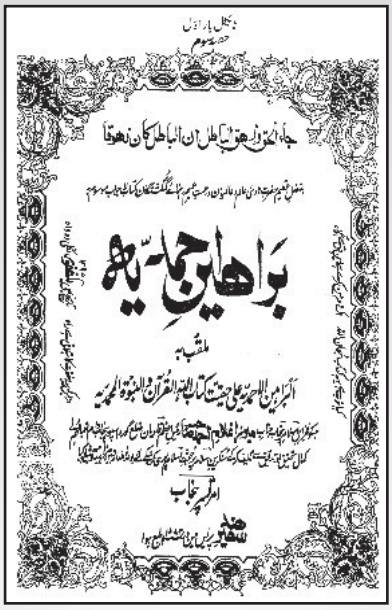

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৩৯তম কিস্তি)

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ
تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ
يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ
وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ
اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ
وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ

আমি কি তোমাদেরকে এ খবর দেবো যে, জ্বীন কাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়? জ্বীন কেবল তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, যারা মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী। তাদের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর কবিদের অনুসরণ কেবল তারা করে, যারা নিজেরা মিথ্যাবাদী। তোমরা কি জান না যে, কবিরা মিত্রাক্ষর বা ছন্দের সন্ধানে জঙ্গলে হাবুডুবু খেতে থাকে, অর্থাৎ তারা কোন ঐশী সত্যের অনুশাসনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা যা কিছু বলে তা করে না। (সূরা আশ শো’আরা: ২২২-২২৭)

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে যে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও ঠিকানা কোনটি? (সূরা আশ শো’আরা: ২২৮)

وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ

আর কুরআনকে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনে অবতীর্ণ করেছি আর সত্য সহকারে তা অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৬)

وَ اِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۙ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

আর তা এমন একটি গ্রন্থ, যা চিরকাল মিথ্যার মিশ্রণ হতে পবিত্র থাকবে। কোন মিথ্যা কখনো এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও কোন সময় পারবে না। অর্থাৎ পূর্ণ সত্য, যা সকল প্রকার মিথ্যা থেকে মুক্ত, সকল মিথ্যা পূজারীদেরকে অভিযুক্ত ও নির্বাক করতে থাকবে তারা পূর্বের হোক বা তাদের জন্ম পরেই হোক না কেন। আর এর সামনে দাঁড়ানোর সামর্থ্য কোন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির

পাদটিকা-১ চলমান: সুতরাং এখানে কিছু এলহাম বিশদভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল, যেগুলোর উল্লেখ করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি–

প্রথম ধরণ:

খোদা আমাকে এলহামের যে কয়েকটি ধরন বা প্রকার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, এর প্রথম প্রকার বা শ্রেণি হলো, খোদা তা’লা কোন অদৃশ্য বিষয় বান্দার সামনে প্রকাশ করতে চাইলে কখনও কোমলতা আর কখনও দৃঢ়তার সাথে কিছু বাক্য সামান্য তন্দ্রায় মুখ থেকে নিঃসৃত করেন। আর যে সকল বাক্য কঠোরতা ও দৃঢ়তার সাথে নিঃসৃত হয়, তা এত জোরালোভাবে মুখে আসে যেমনটি কিনা আকস্মিকভাবে পাথুরে ভূমিতে শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হয় বা খুব দ্রুত ও প্রবল গতিসম্পন্ন ঘোড়ার খুর যেমনটি দ্রুতলয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে (তেমন অনুভূতি হয়)। এই এলহামে এক

নেই। (সূরা হা মীম আস সাজদা: ৪২-৪৩)

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ

আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, সে খোদাকে স্বীয় বিজয় বা প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর খোদার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কেউ তার সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল আহকাফ: ৩৩)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

এই বাণী আমরা স্বয়ং অবতীর্ণ করেছি, আমরা স্বয়ং এর তত্ত্বাবধান করবো। (সূরা হিজর: ১০)

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

তুমি তাদেরকে বল, সত্য এসে গেছে, এরপর মিথ্যার এমন কোন শাখা-প্রশাখা গজাবে না যার খণ্ডন কুরআনে নেই আর তা নিজের প্রথম অবস্থায়ও ফিরে যাবে না। (সূরা সাবা: ৫০)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

কাফেররা বলেছে যে, এখন তোমরা কুরআনের প্রতি কর্ণপাত করো না। আর যখন তোমাদেরকে তা শোনানো হয়, তোমরা কথার ছলে হট্টগোল বাধিয়ে দিও, হয়ত এভাবে তোমরা বিজয় লাভ করবে। (সূরা হা মীম আস সাজদা: ২৭)

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

কতক ইহুদী ও খৃষ্টান বলে যে, এ কৌশলটি অবলম্বন কর অর্থাৎ দিনের প্রথমভাগে ঈমান আন আর দিনের শেষভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করে বস। এভাবে হয়ত মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকবে। (সূরা আলে ইমরান: ৭৩)

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

সুতরাং আমরা তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো আর তাদের অপকর্ম ও নোংরা কর্ম অনুসারে তারা প্রতিদান পাবে। (সূরা হা মীম আস সাজদা: ২৮)

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

মুখের ফুৎকারে তারা খোদার জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু খোদা সেই জ্যোতিকে পরিপূর্ণতা দেয়া পর্যন্ত কখনও নিজের কাজ পরিত্যাগ করবেন না, কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। খোদা সেই সর্বশক্তিমান ও প্রতাপান্বিত সত্তা, যিনি স্বীয় রসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর সকল ধর্মের বিরুদ্ধে এটিকে জয়যুক্ত করার জন্য, মুশরেকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা আত তাওবা: ৩২-৩৩)

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

কাফেরদেরকে তুমি বলে দাও যে, তোমাদেরকে অচিরেই পরাস্ত করা হবে আর অবশেষে জাহান্নামে নিপতিত হবে। (সূরা আলে ইমরান: ১৩)

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, অর্থাৎ পৃথিবীতে ইসলামের সসম্মানে বিস্তার লাভ এবং এর পথে বাধাদানকারীদের লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তোমরা আদৌ একে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। (সূরা আল আন'আম: ১৩৫)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ

ইহুদীরা বলেছে, খোদার হাত বাঁধা রয়েছে অর্থাৎ যা কিছু হয়, তা মানুষের পরিকল্পনায় হয় আর খোদা স্বীয় শক্তিমত্তার সাক্ষর রাখার বিষয়ে অক্ষম। সুতরাং ইহুদীদের হাত খোদা তা'লা চিরতরে বেঁধে দিয়েছেন। (সূরা আল মায়েদা: ৬৫)

পাদটিকা-১ চলমান: অভাবনীয় গতি, দৃঢ়তা ও ত্রাস বিরাজ করে, যার কল্যাণে পুরো দেহ আলোড়িত হয়, আর জিহ্বা এত দ্রুত এবং প্রতাপান্বিত ধ্বনি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতি ও ছন্দময় হয়ে উঠে যেন তা মানুষের নিজের মুখ নয়। এর সাথে এক ধরনের যে তন্দ্রাভাব বিরাজ করে এলহাম সমাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে তা কেটে যায়। এলহামের বাক্য যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, মানুষ অচেতন ও স্থির অবস্থায় মৃতবৎ পড়ে থাকে। এ সকল এলহাম বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেসব পরিস্থিতিতে নাযেল হয়, যখন দয়া ও কৃপার আধার খোদা স্বীয় অদৃশ্য প্রজ্ঞা ও উপযোগিতার নিরিখে কোন দোয়া গ্রহণ করতে চান না বা কিছুদিন তা বিলম্বিত করতে চান বা অন্য কোন খবর দিতে চান, যা মানবিক দুর্বলতার নিরিখে মানুষের কাছে অসহনীয় মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ যখন তড়িঘড়ি কোন বিষয় হাতে পেতে চায় কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞানুসারে তা অর্জিত হওয়া যদি তার জন্য নির্ধারিত না থাকে বা যদি পরে লাভ হওয়া নির্ধারিত থাকে, তখন এমন ভারী ও প্রতাপান্বিত ওহী অবতীর্ণ হয়, যা খোদার নির্দেশে মুখ থেকে নিঃসৃত হতে থাকে। কোন কোন সময় আমার প্রতিও (এমনটি) হয়েছে, যা বর্ণনা করা দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হবে। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, কেবল একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য উপস্থাপন করছি। তা হল, খুব সম্ভব তিন বছরের মত সময়-কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে, আমি এ লক্ষ্যে দোয়া করি যে, মানুষ যেন এ গ্রন্থের (ছাপা ও প্রচার কার্যের প্রতি) মনোযোগী হয়– তখন সুদৃঢ় ও কঠোর তাকিদপূর্ণ সেই এলহাম, যার কথা এখন আমি উল্লেখ করলাম, بالفعل نہیں শব্দে অবতীর্ণ হয় আর এই এলহাম যখন এ অধমের প্রতি নাযেল হয়, তখনই প্রায় ১০-১৫ জন হিন্দু ও মুসলমানকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যারা আজও কাদিয়ানে বসবাস করছে। এছাড়া এলহাম অনুসারে যেভাবে মানুষের পক্ষ থেকে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়েছে তা-ও এরা ভালোভাবে অবহিত। দ্বিতীয় প্রকার এলহাম, অর্থাৎ এমন এলহাম, যাতে মুখ থেকে কথা কিছুটা কোমলতার সাথে মসৃণভাবে নিঃসৃত হয়, এ শ্রেণির (এলহামের) ক্ষেত্রে কেবল নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এতটা লেখা যথেষ্ট হবে যে, উপরোক্ত প্রথম এলহামের পর একটি দীর্ঘসময় কেটে যায়। মানুষের অমনোযোগের কারণে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা দেখা দেয় আর সমস্যার কোন অন্ত ছিল না। এমতাবস্থায় একদিন সন্ধ্যার দিকে মহান আল্লাহ্ এই এলহাম করেছেন هزّ إليكَ بجذع النخلة تساقط عليكَ رطبا جنيا (সূরা মরিয়ম: ২৫) তখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, এটি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা ও তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার প্রতি ইঙ্গিত। অধিকন্তু এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, বইয়ের এ অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের ফলেই অর্থ সংগৃহীত হবে। এ সংক্রান্ত সংবাদও যথারীতি কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমানকে দেয়া হয়েছে। দৈবক্রমে সেদিন বা পরের দিন, হাফেয হিদায়েত আলী

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

যদি তাদের পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনার কোন অর্থ থাকে, তাহলে এর শক্তি-বলে পৃথিবীর রাজত্ব ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করুক। তাদেরকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যেখানেই থাকুক না কেন, তারা লাঞ্ছিত ও পরাধীন হিসেবে থাকবে। আর তাদের জন্য এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, পরাধীনতার গ্লানি বরণ করা ছাড়া কারও দেশে সসম্মানে থাকতে পারবে না। দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য সর্বদা তাদের অদৃষ্ট হবে। এর কারণ হলো, তারা খোদার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার আর খোদার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আসছে এবং এ কারণেও যে, তারা অবাধ্যতা ও পাপের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করেছে। (সূরা আলে ইমরান: ১১৩)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

আমাদের রীতি হলো, আমরা ইহকাল ও পরকালে আমাদের পয়গম্বর ও বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করে থাকি। (সূরা আল মু'মিন: ৫২)

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

খোদা এই সিদ্ধান্তই করে রেখেছেন যে, 'আমি ও আমার রসূল জয়যুক্ত হবো'। খোদা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল মুজাদিলা: ২২)

وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

খোদাকে বাদ দিয়ে কাফের তোমাকে অন্যান্য জিনিসের ভয় দেখায়। (সূরা আয যুমার: ৩৭)

قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ اِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

তুমি তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে পরাজিত করার জন্য স্বীয় সেসব উপাস্যদের সাহায্য যাচনা কর, যারা তোমাদের মতে খোদার সমকক্ষ, আর আমার ব্যর্থতার জন্য সকল প্রকার ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দিও না। (জেনে রাখ!) আমার কার্যবিধায়ক ও কার্যনির্বাহক হলেন সেই খোদা যিনি আপন গ্রন্থ নাযিল করেছেন। তাঁর নিয়ম হলো, পুণ্যবানদের কাজ তিনি নিজেই করেন আর তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিজ থেকেই নেন। (সূরা আল আ'রাফ: ১৯৬-১৯৭)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

তুমি তোমার খোদার নির্দেশে ধৈর্য্য ধারণ কর আর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাক। তুমি আমাদের স্নেহ-দৃষ্টিতে রয়েছ। (সূরা আত তূর: ৪৯)

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

যারা তোমাকে হত্যা করতে ওঁৎ পেতে আছে, তাদের দুষ্কৃতি থেকে খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন। (সূরা আল মায়েদা: ৬৮)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পাদটিকা-১ চলমান: খান সাহেব কাদিয়ান আসেন, যিনি সে সময়ে এ জেলায় এক্সট্রা এসিসটেন্ট ছিলেন, তাকেও এলহাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আমার মনে পড়ে, একই সপ্তাহে আমি তার বন্ধু মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকেও অবহিত করেছি। এখন সার কথা হল, এই এলহাম অবতীর্ণ হওয়ার পর মহাসম্মানিত খোদার নির্দেশ অনুসারে আমি মানুষকে আহ্বান জানাই। এরপর লাহোর, পেশাওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, মালির কোটলা এবং আরো কয়েকটি স্থান থেকে, এক কথায় যেখান থেকে খোদা যতটা চেয়েছেন, ছাপাধীন এই অংশের জন্য সাহায্য আসে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। এই সময় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, তা হল, একদিন প্রভাতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আকস্মিকভাবে মুখ থেকে 'আবদুল্লাহ্ খান ডেরা ইসমাঈল খান' নিঃসৃত হয়। এটিও একই প্রকার এলহামের একটি দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে কয়েকজন হিন্দুকেও অবহিত করা হয়, যারা তখনও আমার কাছে ছিল আর এখনও এখানেই বসবাস করে। সেদিন কাকতালীয়ভাবে সেই হিন্দুদের একজন ডাকঘরে যায় এবং আবদুল্লাহ্ খান নামক এক ব্যক্তির প্রেরীত একটি পত্র নিয়ে আসে। একই সাথে কিছু রুপিও আসে। উল্লিখিত ঘটনার কিছুদিন পূর্বে অতি আশ্চর্যজনক একটি ঐশী নিদর্শন প্রকাশ পায়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, কাদিয়ানের স্থানীয় স্কুলে অধ্যয়নরত ২০ বা ২২ বছর বয়স্ক একজন স্থানীয় আর্য-হিন্দু, যে এখনো এখানে অবস্থান করছে, দীর্ঘদিন ধরে যক্ষা রোগে আক্রান্ত ছিল। ধীরে ধীরে তার রোগ মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং নৈরাশ্যকর লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। একদিন সে আমার কাছে এসে অঝোরে কাঁদতে থাকে এবং জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য ব্যক্ত করে। তার করুণ দশা দেখে আমার অন্তর বিগলিত হয় আর খোদার দরবারে আমি তার জন্য দোয়া যাচনা করি। যেহেতু খোদার সন্নিধানে তার সুস্থতা লাভ নির্ধারিত ছিল, তাই দোয়া করতেই এলহাম হয় قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِى بَرْدًا وَّ سَلَامًا অর্থাৎ আমরা যক্ষার অগ্নিকে বললাম তুমি ঠান্ডা ও শীতল হয়ে যাও। তখনই সেই হিন্দুসহ আরো কয়েকজন স্থানীয় হিন্দুকে এই এলহাম সম্পর্কে অবহিত করা হয় যারা এখনও এ গ্রামেই বসবাস করে। একইসাথে খোদার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে দাবি করা হয় যে, সে অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং এ রোগে সে আদৌ মরবে না। এরপর এক সপ্তাহ না কাটতেই, উক্ত হিন্দু প্রাণসংহারী সেই রোগ থেকে পূর্ণ নিরাময় লাভ করে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। মৌলভী সাহেব! এখন দেখুন, একে বলা হয় প্রমাণ। ধর্মের শত্রুদের বরাতে আর দয়ানন্দের অনুসারীদের সাক্ষ্য সংযুক্ত করে ইসলামের সত্য ও কল্যাণময় এলহামের প্রমাণ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং ধর্ম বিরোধীদেরকেই সাক্ষী নির্ধারণ করা-এর চেয়ে দৃঢ়তর কোন প্রমাণ পৃথিবীতে আছে কি? হে আমার সুহৃদ! আপনি কোথায় আর কোন্ দেশে এবং অন্য কোন্ ধর্ম, যেমন খ্রিষ্টান, আর্য ও ব্রাহ্মণদের মাঝে ভয়াবহ বিরোধীদের সাক্ষ্য-সম্বলিত এ ধরনের সত্য ও আশিসময় এলহাম দেখেছেন যাতে এক নিরাশ ব্যক্তির জীবিত থাকার সংবাদ দেয়া হয়ে থাকবে– আর তাও এমন, যেন এক মৃত ব্যক্তি জীবন লাভের শুভসংবাদ লাভ করল? চাক্ষুষ কোন ঘটনা যদি স্মৃতিপটে থাকে, তাহলে দু'একটি উল্লেখ করুন। এখন বলুন, এই আশিসময় এলহাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য নয় কি? অনুরূপভাবে শত শত এমনই সুমহান এলহাম সম্পর্কে আমাদের কাছে এত প্রমাণাদি রয়েছে যা আপনারা গুণেও শেষ করতে পারবেন না। আপনি দিনকে রাত আখ্যায়িত করেছেন, তবে বলুন, সূর্যকে এখন কোথায় লুকাবেন? আপনি ইসলাম ধর্মের বিরোধীদের ঘর সম্পর্কে কিছু খবর রাখেন কি? সেখানে ঈমানের জ্যোতি তো দূরের কথা, ঈমানই নেই। وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ আপনি যদি একথা বলেন যে, আমরা ওলি-আল্লাহ্‌গণের এলহামে বিশ্বাস করি এবং একে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বিশেষত্ব হিসেবে গ্রহণ করি; কিন্তু ওলীদের প্রতি যে এলহাম হয়, একে সুনিশ্চিত জ্ঞানের কারণ মনে করি না, বরং আনুমানিক জ্ঞানের কারণ মনে করি! (চলবে)

জুমুআর খুতবা

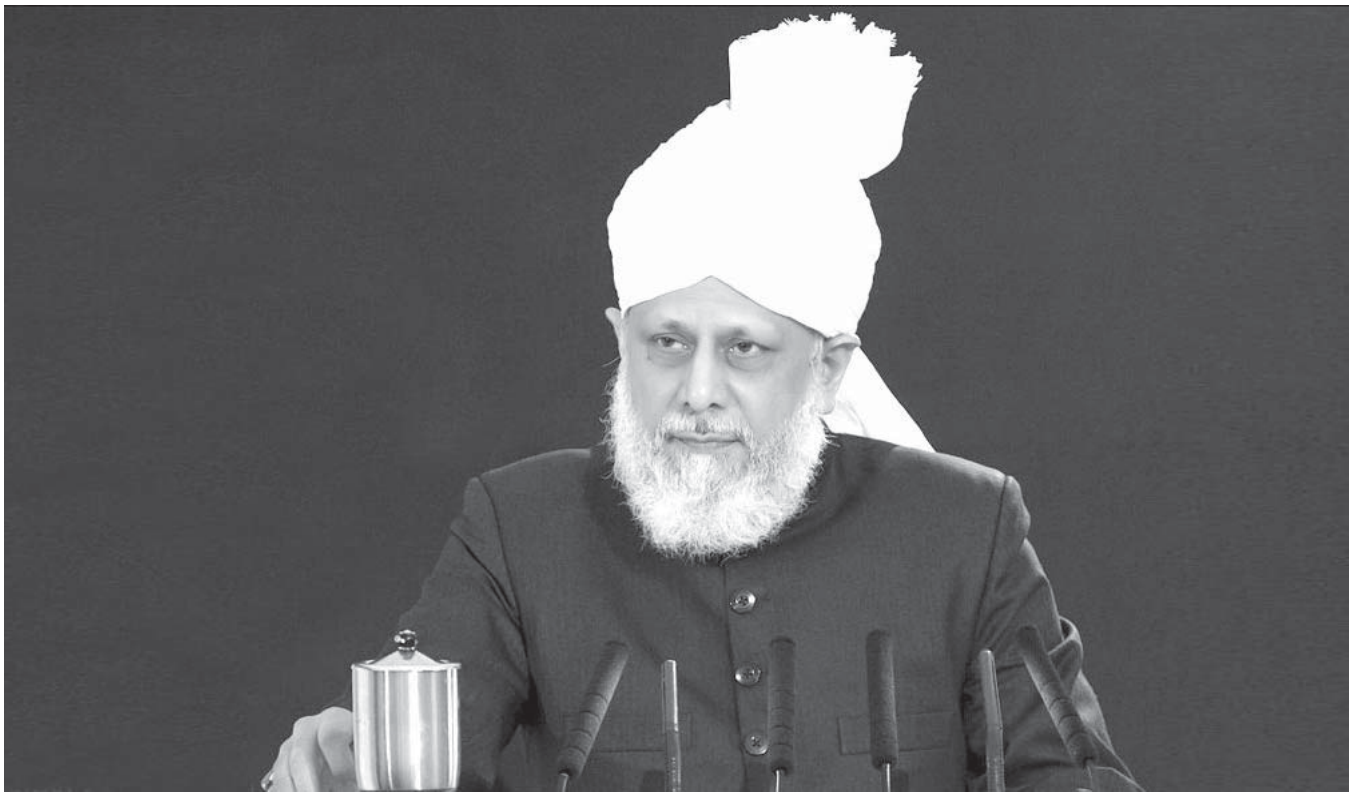

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত শিক্ষণীয় গল্পের উল্লেখ সহ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি প্রদান করে জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত কিছুকাল যাবৎ কতিপয় জুমুআর খুতবায় আমি বিভিন্ন কাহিনী বা ঘটনা অথবা শিক্ষণীয় গল্প উপস্থাপন করে আসছি যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। আজও যখন আমি এমন সব ঘটনা বর্ণনার জন্য নির্বাচন করছিলাম তখন আমার মনে হলো, পাক-ভারতের এসব পুরোনো কাহিনী, গল্প বা ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, এসব গল্প বা ঘটনা আজ পর্যন্ত চলমান থাকাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই। যদি জামাতের বই-পুস্তকে এগুলো সংরক্ষিত না হতো তাহলে অনেক আগেই তা কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত আর আধুনিক যুগে কেউ এসব ঘটনা সম্পর্কে জানতোই না। আজ বেশ কয়েকটি ভাষায় এগুলোর অনুবাদ হয়। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, আজও সেই ধারাবাহিকতায় কিছু গল্প বা কাহিনী আমি উপস্থাপন করবো। এগুলো নিছক কাহিনী নয় বরং কিছু ঘটনা বাস্তবও বটে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসবের সূত্রধরে কিছু নসীহত করেছেন। কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা বাহ্যত চুটকী বা কৌতুক, কিন্তু তাতেও আত্মসংশোধনের কতিপয় দিক তিনি (আ.) আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এমনই একটি কৌতুক এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন মালিনীর দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি

এটি অবশ্যই বৈধ, বিচারের জন্য মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। কিন্তু সালিশের মাধ্যমে যদি নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয় আর নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা উচিত নয়।

সবার জন্য আবশ্যক হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের কোন নির্দেশ অমান্য না করা। কিন্তু অনেক যুবক এমনও আছে যারা পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না আর তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়েও যত্নবান নয়।

বলতেন, তার দু'জন কন্যা ছিল। একজনের বিয়ে হয়েছিল কুমারদের ঘরে আর দ্বিতীয় জনের বিয়ে হয় মালির ঘরে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেই সেই মহিলা উন্মাদের মতো ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করত। মানুষ জিজ্ঞেস করতো, হয়েছে কী? সে বলতো, আমার এক মেয়ে আর নেই। কেন? সে বলতো, বৃষ্টি হলে কুমারদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না। কেননা, তাদের ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার বৃষ্টি না হলে সে বলতো মালীদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা, বৃষ্টি না হওয়ার দরুন তাদের ফসল বা সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হবে না। যাহোক, বৃষ্টি হলে কুমারদের তৈরি বাসন-কোসন বা হাঁড়ি-পাতিল নষ্ট হবে আর বৃষ্টি না হলে সবজি উৎপাদনকারীদের সবজি ইত্যাদির ক্ষতি হবে। (খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১১)

বাহ্যতঃ এটি সামান্য একটি কথা কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই প্রেক্ষাপটে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাহলো, কাদিয়ানে দু'ব্যক্তির মাঝে পরস্পর মতভেদ হয় বা কোন ঝগড়া হয়। বন্ধুরা তাদেরকে বুঝিয়ে মিমাংসার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের উভয়েই বলে, আমরা ইংরেজি আদালতের শরণাপন্ন হবো এবং তাদের দ্বারাই সিদ্ধান্ত করাবো, আর সরকারী বিচার বিভাগে একে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করে।

মামলার শুনানী যখনই হতো তারা স্বয়ং বা তাদের কোন প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে দোয়ার অনুরোধ জানাতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, উভয়েই আমার মুরীদ আর তাদের উভয়ের সাথেই আমার সম্পর্ক আছে, কার পক্ষে জয়ের আর কার বিরুদ্ধে পরাজয়ের দোয়া করবো? আমি তো এই দোয়া করি যে, তাদের মাঝে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে-ই যেন জয়যুক্ত হয়। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এখনও আহমদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যখন বিচার বিভাগে বা আদালতে মামলা করে তখন একই সাথে তারা আমার কাছেও দোয়ার জন্যও লিখে পাঠায়। এভাবে দোয়ার জন্য বলা তেমনই যেমন বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। হয় কুমারদের ঘরে যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে অথবা মালীর ঘরে যার বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে। একজন তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কেউ যেন আবার একথা মনে না করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেহেতু মামলা-মোকদ্দমার চল ছিল তাই আজও এমনটি করলে কোন অসুবিধা নেই বা এটি বৈধ। এটি অবশ্যই বৈধ, বিচারের জন্য মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। কিন্তু সালিশের মাধ্যমে যদি নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয় আর নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই আচরণ পছন্দ করেননি। তাই নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন ভালো নয়। অতএব হঠকারিতাও বর্জন করা উচিত আর দোয়ার অনুরোধ করে ইমামকেও সমস্যা বা কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়া উচিত নয়। উভয় পক্ষই যদি আহমদী হয় তাহলে কার জন্য দোয়া করবেন আর কার জন্য করবেন না। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই দোয়া করেছিলেন আমিও সেই দোয়াই করি, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! ন্যায্য অধিকার যার তুমি তাকেই সফলতা দান কর।

আল্লাহ্ তা'লা একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর তা হলো, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়া বা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী ব্যতিরেকে বাকি সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা উচিত, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত। যখন ধর্মীয় বিষয় আসে বা ধর্মের প্রশ্ন আসে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, আমি অবশ্যই আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে এখানে যেহেতু খোদার অধিকারের প্রশ্ন তাই একথা মানা আমার জন্য কঠিন, এটি আমার সীমাবদ্ধতা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সবার জন্য আবশ্যক হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের কোন নির্দেশ অমান্য না করা। কিন্তু অনেক যুবক এমনও আছে যারা পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না আর তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়েও যত্নবান নয়। বরং সন্তান-সন্ততির মাঝে কেউ যদি কোন ভালো পদে নিযুক্ত হয় বা ভালো পদবী লাভ করে তাহলে সে নিজের দরিদ্র পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতেও লজ্জা বোধ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন, কোন এক হিন্দু বড় কষ্ট করে তার ছেলেকে বি.এ এবং এম.এ পাশ করিয়েছে। আর সেই ডিগ্রি অর্জনের পর সে ডেপুটি নিযুক্ত হয় এবং দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যায়। সে যুগে, ডেপুটি পদে নিযুক্ত হওয়া অনেক বড় সম্মানজনক বিষয় ছিল। যদিও আজকের যুগে এটিকে খুব একটা বড় পদ বলে গণ্য করা হয় না। একদিন তার পিতার মনে এই বাসনা জাগে যে, আমার ছেলে ডেপুটি নিযুক্ত হয়েছে, আমিও তার সাথে দেখা করে আসি। সেই হিন্দু যখন তার সন্তানের সাথে দেখা করার জন্য তার মজলিস বা বৈঠকে পৌঁছে সে সময় তার কাছে উকিল এবং ব্যারিস্টাররা উপবিষ্ট ছিল। তার পিতাও নিজের নোংরা ধূতি পরিহিত অবস্থায় এক কোনায় বসে পড়ে, কথাবার্তা চলতে থাকে। তার সেখানে বসা মজলিসের কোন একজনের পছন্দ হয়নি, সে জিজ্ঞেস করে, আমাদের এই

কুরআনে অভিনিবেশ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেসব তফসীর লিখেছেন তাও পড়া উচিত। এছাড়া কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে খলীফাদেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা তফসীর রয়েছে তাও দেখা উচিত। সেই সাথে নিজেদেরও ভাবা উচিত আর কুরআন থেকেই জ্ঞান এবং তত্ত্ব-ভান্ডার উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত।

বৈঠকে বা মজলিসে এই ব্যক্তি কে বসে আছে? ডেপুটি সাহেব তার কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হয় আর লজ্জা এড়ানোর জন্য বলে, এ ব্যক্তি আমাদের পরিচারক বা খাদ্য পরিবেশক। পুত্রের এই কথা শুনে পিতা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং নিজের চাদর গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, জনাব আমি তার ভৃত্য নই বরং তার মায়ের পরিচারক।

পাশে উপবিষ্ট মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, ইনি ডেপুটি সাহেবের পিতা তখন তারা অনেক অভিযোগ-অনুযোগ করে যে, পূর্বেই যদি আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন তাহলে আমরা তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতাম, তাকে শ্রদ্ধার সাথে বসাতাম। যাহোক, এ ধরনের দৃশ্যও চোখে পড়ে যে, আত্মীয়-স্বজন যদি দরিদ্র হয় তাহলে মানুষ তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে দ্বিধা প্রকাশ করে, তা তিনি পিতাই হোন বা অন্য যে-ই হোক না কেন, যাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার কোথাও হানি না ঘটে। এক কথায় পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, মানুষ তাদেরকে এড়িয়ে চলে। পিতা-মাতার নাম সমুজ্জ্বল করা তো দূরের কথা বরং তারা তাদের জন্য কলঙ্কের কারণ হয়। (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৩)

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন, কতক আলেম বা বক্তাদের বক্তৃতা মানুষ সাময়িকভাবে উপভোগের মানসে শুনে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ সম্পর্কে বলেছেন, বৈঠকে কেবল এজন্য আসবে না যে, অমুক ব্যক্তি সুবক্তা তাই তার বক্তৃতা শুনবো বরং এটি দেখ, সেই বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে আর তা থেকে কীভাবে লাভবান হওয়া যায়। যাহোক কিছু মানুষ বক্তার কথার গভীরতাও অনুধাবন করে না আর তাদের বক্তৃতাও বুঝে না আর বক্তার কথার উদ্দেশ্য কী তাও বুঝতে পারে না বরং শুধু সাময়িকভাবে উপভোগের জন্য বসে থাকে।

একইভাবে কতক বক্তাও সাময়িক আবেগ সৃষ্টির জন্য জোরালো বক্তৃতা করে বা করার চেষ্টা করে আর গলা থেকে বিভিন্নপ্রকার আওয়াজও বের করে এবং কৃত্রিমভাবে আবেগ সৃষ্টির বা মানুষের মন গলানোরও চেষ্টা করে। এমনই এক বক্তার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বক্তার কথা বলতেন। সেই ব্যক্তি বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হয়। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তুও ছিল বড় আবেগঘণ। এক ব্যক্তি সেখানে আসে এবং দাঁড়িয়ে পড়ে। সে কৃষক ছিল আর তার হাতে ছিল একটি 'তিরংড়ি'। তিরংড়ি ত্রিশাখাবিশিষ্ট ত্রিশূলসদৃশ কৃষি যন্ত্রকে বলা হয় যার একটি দীর্ঘ হাতলও থাকে আর এটি গম মাড়াই করার পর খড় ইত্যাদি একত্রিত করার কাজে ব্যবহার হয়। আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের পূর্বেপাশ্চাত্যেও এটি ব্যবহৃত হতো। যাহোক সে গ্রাম থেকে আসে এবং বক্তৃতা শোনার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে যত লোক বসে ছিল তাদের ওপর এই বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু সেই কৃষক কিছুক্ষণ পরই কাঁদতে আরম্ভ করে। সেই বক্তার দুর্ভাগ্য, তার হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা দানা বাঁধে। সে ধরে নেয়, আমার বক্তৃতায় এই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছে। সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, দেখ! মানুষের হৃদয়ও বহু প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার হৃদয়ের অধিকারী হলে তোমরা যারা ঘন্টার পর ঘন্টা আমার বক্তৃতা শুনছো কিন্তু তোমাদের হৃদয় আদৌ এতে প্রভাবিত হয়নি আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র এই বান্দাকে দেখ! তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে বক্তৃতার প্রভাব পড়েছে। সে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এসে দন্ডায়মান হয় এবং কাঁদতে আরম্ভ করে।

এরপর তার ওপর যে, কত গভীর প্রভাব পড়েছে তা মানুষের সামনে প্রকাশের জন্য সে সেই কৃষককে জিজ্ঞেস করে, মিঞাঁ! কোন কথাটি তোমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তুমি কেঁদে উঠলে? (যারা পুরোনো কৃষক তারাই এটিকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে) সে বললো, গতকাল আমার বাছুরটি এভাবেই আওয়াজ করতে করতে মরে যায়, আপনার আওয়াজ শুনে আমার সেই বাছুরের কথা মনে পড়ে গেলো, তাই আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। (খুতবাতে মাহমুদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৭)

একথা শুনে সেই বক্তা খুবই লজ্জিত হয়। বস্তুতঃ সেই কৃষক আবেগ আপ্লুত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা হয়েছে সেই বক্তার কয়েকবার চিৎকার করে কথা বলা আর কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম আবেগ প্রকাশ করার জন্য গলা থেকে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ বের করার কারণে। আর ফলে কৃষকের নিজ বাছুরের কথা মনে পড়ে যায়, মৃত্যুর সময় যার গলা দিয়ে এমনই অদ্ভুত আওয়াজ বের হয়েছিল। সেই বক্তা সাহেবের নিজের বক্তৃতা সম্পর্কে ভুলধারণা জন্মে যে , হয়তো আমার বিগলিত চিত্তের বক্তৃতা শুনেই এই ব্যক্তি কেঁদে উঠেছে। কিন্তু তার লোকদেখানো ভাব এবং কৃত্রিমতা এই ধারণাকে তাৎক্ষণিকভাবে মিথ্যা প্রমাণ করে। আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মৌলভী বড় বড় বুলি আওড়ায় তাদের বক্তৃতা শুনলেও প্রায় সময় দেখবেন, তাদের গলা থেকেও অবিকল এমন আওয়াজই বের হয়। যাহোক এটি তাদের কাজ, বিশেষ ভাবে যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাদের মাঝে উম্মাদনা মাথা চাড়া দেয়, যারা পাকিস্তানে থাকেন বা যারা সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে এসেছেন তারা ভালো বুঝতে পারবেন আর যারা এমন বক্তৃতা শুনেছেন তারা জানেন যে, মৌলভীদের বক্তৃতা কেমন হয়ে থাকে।

আমাদের প্রতি খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য পেয়েছি নতুবা ইসলামের নামে পীর ফকিররা যেই ব্যবসা আরম্ভ করে রেখেছে আজকে আমরাও হয়তো সেসবেরই অংশ হতাম। এই পীর সাহেবরা দাবি করে যে, তারা অনেক উন্নত মার্গের মানুষ। তারা বলে, আমরা দোয়ার মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করি, আমাদের আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গভীর নৈকট্য

> জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও একান্ত আবশ্যক, আর পৃথিবীতে এর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।
>
> একজন আহমদী হিসেবে আমাদের ঈমানের হিফাযত তখনই সম্ভব যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে আমাদের দৃঢ় এবং অব্যাহত সম্পর্ক থাকে। আর এর জন্য সেসব মাধ্যমও কাজে লাগানো উচিত যার কল্যাণে দূরে বসেও এ সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুণ্ন থাকতে পারে।

রয়েছে, দুনিয়ার প্রতি আমরা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। কিন্তু এদের আমলের স্বরূপ কী? এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন, নিজের সম্পর্কে সেই ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, সে অনেক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত মানুষ। একবার এক মুরীদের ঘরে গিয়ে বলে, আমার ট্যাক্স নিয়ে আস অর্থাৎ আমাকে নযরানা দাও। দুর্ভিক্ষ ছিল, মুরীদ বলে, এখন কিছুই নেই, এবারের জন্য ক্ষমা করুন। কিন্তু পীর সাহেব দীর্ঘ সময় বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থেকে অবশেষে তার কোন জিনিস বিক্রি করিয়ে তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বিদায় হয়। এমন সব নোংরামি আর দুর্বলতা এদের মাঝে দেখা যায় অথচ বড় বড় দাবিও করে যে, আমরা অনেক উচ্চ মার্গের বুজুর্গ। (যিকরে ইলাহী, আনওয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫)

এগুলো সেযুগের পুরণো কোন বিষয় নয় আজও পাকিস্তান বা এ ধরনের দেশে এমন পীর রয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রজ্ঞা এবং তত্ত্বজ্ঞানের যে বিবরণ রয়েছে তা জ্ঞানের সকল দিক এবং শাখাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অবশ্য এটি ভিন্ন কথা যে, আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বা চিন্তা-ভাবনার অভাবে এর গভীরে অবগাহনের সামর্থ বা যোগ্যতা আমরা রাখি না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল নীতি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন শরীফে বিদ্যমান। তিনি বলেন, কুরআন সম্পর্কে আমি হয়তো সেভাবে প্রণিধানের সুযোগই পাইনি বা আমার তত্ত্বজ্ঞান হয়তো এখনও সেই মার্গে পৌঁছেনি কিন্তু যতটুকু তত্ত্বজ্ঞান আমার লব্ধ হয়েছে তার আলোকে আর জ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতাকে পূঁজি করে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, কুরআনের বাইরে আর কোন জিনিসের আমাদের প্রয়োজন নেই। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ১৩, পৃ. ৫০৩)

অতএব কুরআনে অভিনিবেশ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেসব তফসীর লিখেছেন তাও পড়া উচিত। এছাড়া কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে খলীফাদেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা তফসীর রয়েছে তাও দেখা উচিত। সেই সাথে নিজেদেরও ভাবা উচিত আর কুরআন থেকেই জ্ঞান এবং তত্ত্ব-ভান্ডার উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত।

কেউ কেউ মনে করে, আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি আর তাই যথেষ্ট। অন্য কোন কিছুর আমাদের প্রয়োজন নেই। কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। কারো সাথে কোন পরামর্শ করার আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্মরণ রাখার বিষয় হলো, জ্ঞানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি শুধু বই-পুস্তক পাঠ করে ডাক্তার হতে চায় তাহলে এটি খুব কঠিন বিষয় বরং অসম্ভব বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ার পাশাপাশি যোগ্য ডাক্তারদের সামনে রোগীদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করাও আবশ্যক। কেউ যদি বই-পুস্তক পড়ে ডাক্তার হয়ও তবু এরপর তার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের সামনে রোগ নির্ণয় এবং রোগীর চিকিৎসা করাও আবশ্যক হয়ে থাকে।

এ কারণেই কলেজে ডাক্তারদেরকে পড়ানোর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সামনে তাদের প্র্যাক্টিক্যালও হয়ে থাকে কেননা; তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও হওয়া চাই। যদি এমনটি না হয় তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না আর কিছুই শিখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এরপরও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে, শুধু পড়ালেখা চলাকালেই অভিজ্ঞতা অর্জন করলে হবে না বরং পরবর্তীতেও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়।

যাহোক কোন চিকিৎসক বা ডাক্তারের চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান তখনই পরিপক্ক হবে যদি সে নিয়মিত রোগী দেখতে থাকে। যদি তা না করে তাহলে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা কল্যাণকর হতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জ্ঞান এবং কর্ম সম্পর্কে বলতেন, একজন চিকিৎসক ছিল যে অনেক বড় জ্ঞানী ছিল। সে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভালো জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার পড়াশোনা ছিল অনেক ব্যাপক। রাজা রঞ্জিত সিংয়ের খ্যাতির কথা শুনে সে দিল্লী থেকে পদোন্নতির আশায় তার দরবারে পৌঁছে। রঞ্জিত সিংয়ের মন্ত্রী ছিল মুসলমান। সে এই চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে। সেই চিকিৎসক মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করে, মহারাজাকে সাক্ষাতের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ করা হোক। সে বলে, আমি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। মন্ত্রীর আশঙ্কা হয়, যদি এর প্রভাব বৃদ্ধি পায় তাহলে কোথাও আবার আমার না পতন ঘটে। কিন্তু সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ না করাকেও সে সততা ও মানবতা পরিপন্থী বলে মনে করে। এছাড়া ডাক্তারের সাথে কথা বলে সে বুঝতে পেরেছিল, এর ব্যবহারিক কোন অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে।

মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের দরবারে মুসলমান মন্ত্রী সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ করে এবং বলে, হুযূর! ইনি অনেক বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, অমুক অমুক কিতাব পড়েছেন। মন্ত্রী তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করে। মহারাজা রঞ্জিত সিং তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে বলো, ইনি চিকিৎসা করেছেন কিনা বা তার চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মন্ত্রী উত্তরে বলেন, হুযূরের কল্যাণে অভিজ্ঞতাও হয়ে যাবে, আপনার ওপরেই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। রঞ্জিত সিং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান অর্থহীন। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতার জন্য বেচারা রঞ্জিত সিংই রয়ে গেলো? তাই ডাক্তার সাহেবকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দেয়াই সমীচীন হবে। (খুতবাতে মাহমুদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯)

অতএব জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক

অভিজ্ঞতাও একান্ত আবশ্যক, আর পৃথিবীতে এর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। যে কোন কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের পর যদি প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা না হয় তাহলে অনেক এমন বাধা বিপত্তি সামনে আসে যখন কাজ করতে গিয়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে আর বুঝতে পারে না যে, এখন কি করব। মানুষ অচল হয়ে যায় আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যেই সমস্যা বা বাধা-বিপত্তি সামনে থাকে তা দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। অতএব, কেবল জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যদি নিজেকে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা আরম্ভ করে তাহলে সে রঞ্জিত সিংয়ের উত্তরই পাবে। জামাতের সার্বিক উন্নতির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুবক শ্রেণীর আধুনিক জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করা উচিত আর অভিজ্ঞ লোকদের সাথে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জামাতের কল্যাণে সেটিকে ব্যবহার করা উচিত। অনেকেই এই পরামর্শ দেয় যে, নতুন প্রযুক্তি আছে এটি ব্যবহার করা উচিত বা এটি করতে হবে। অনেক সময় জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত তো ঠিক আছে কিন্তু কিছু বিষয় বা সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূরীভূত করা আবশ্যক হয়ে থাকে অথবা এমন সব প্রতিবন্ধকতাও সামনে আসতে পারে যা সম্পর্কে চিন্তা করা বা ভাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে আর অভিজ্ঞরা এটি খুব ভালো বুঝবে।

একজন আহমদী হিসেবে আমাদের ঈমানের হিফাযত তখনই সম্ভব যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে আমাদের দৃঢ় এবং অব্যাহত সম্পর্ক থাকে। আর এর জন্য সেসব মাধ্যমও কাজে লাগানো উচিত যার কল্যাণে দূরে বসেও এ সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। এক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামাতী বিষয়ে সদস্যরা কখনও উন্নতি করতে পারবে না বরং তারা জীবিতই থাকতে পারবে না যতক্ষণ মূলের সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকবে। আর এযুগে এই সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম উপায় হলো, পত্র-পত্রিকা। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন যদি জামাতের পত্র-পত্রিকা তার কাছে পৌঁছতে থাকে তাহলে এটি পাশে বসে থাকারই নামান্তর। এর দৃষ্টান্ত এমনই, যেমন কিনা এখন আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। তিনি (রা.) বলেন, যেমন এখন মহিলাদের জলসা হচ্ছে আর মহিলারা লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধমে বক্তৃতা শুনছে। যদি মাইকের মাধ্যমে তাদের কাছে আওয়াজ না পৌঁছতো বা তাদের কর্ণগোচর না হতো তাহলে তারা কিছুই বুঝতে পারতো না যে, কি বলা হচ্ছে। অতএব লাউডস্পিকার বা মাইক মহিলাদেরকে আমার বক্তৃতার নিকটতর করেছে। এখানেও লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধ্যমে মহিলাদের হলরুমে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আর তারা শুনতে পাচ্ছে, এটিও এক ধরনের নৈকট্য।

অনুরূপভাবে দূরে বসবাসকারীদেরকে জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত রাখে এই সব পত্র-পত্রিকা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সবসময় বলতেন, আল্‌হাকাম এবং বদর হলো আমাদের দু'টো বাহু। যদিও কখনো কখনো এই পত্রিকাগুলো এমন সংবাদও ছেপে দিতো যা ক্ষতিকর হতো কিন্তু এর উপকারিতা যেহেতু ক্ষতি থেকে অধিক ছিল তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আমাদের এমন মনে হয় যেন এ দু'টো পত্রিকা আমাদের দু'টো বাহু। এখানে দু'টো বাহু হওয়ার অর্থ হলো, এর মাধ্যমে আমাদের যে বাহু অর্থাৎ জামা'ত রয়েছে তা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত বা সন্নিবেশিত রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বন্ধুদের জামাতের পত্র-পত্রিকার প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল অথচ তখনকার জামাত আজকের তুলনায় এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। আর আজকে তো শতভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ হবে।

'বদর' পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা এক সময় চৌদ্দ থেকে পনের শ'য়ে পৌঁছে যায় কিন্তু এরপর তা কমতে থাকে। একইভাবে 'আল্ হাকাম'-এর গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। জামাতের বন্ধুরা সে যুগে পত্র-পত্রিকা অনেক বেশি ক্রয় করতেন। এমনকি যারা শিক্ষিত ছিল না তারাও পত্রিকা ক্রয় করে অন্যদেরকে পড়ার জন্য দিতো, আর মনে করতো, এটি তবলীগের একটি মাধ্যম। (মিসরী সাহেবকে খেলাফতসে ইনহেরাফকে মুতা'ল্লেক তাকরীর, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড ১৪, পৃ. ৫৪৪-৫৪৫)

যেমন একজন আহমদী টমটম গাড়ি চালাতেন। তিনি খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি আল্ হাকাম আনিয়ে টমটম গাড়িতে বা ঘোড়ার গাড়িতে রেখে দিতেন। টমটম গাড়ীতে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় চেহারা দেখে বুঝতে পারতেন যে ইনি শিক্ষিত মানুষ। তখন তাকে পত্রিকা দিয়ে বলতেন, এই পত্রিকাটি এসেছে, আমাকে একটু পড়ে শোনান। আর এভাবে আরোহী বা প্যাসেঞ্জার নিজ গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামার পূর্বে পত্রিকার নাম ঠিকানা নোট করে নিত আর এভাবে জামা'তের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন হতো আর বয়আতও হতো। মানুষ বলতো, তিনি অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আর টমটম গাড়ীর চালক হয়েও নিজ এলাকায় সবচেয়ে বেশি বয়আত করিয়েছেন। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন।

নিজেদের তরবীয়ত এবং খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সব আহমদীর প্রধানতঃ এমটিএ শোনা আবশ্যক, এমটিএ শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। দ্বিতীয়তঃ তবলীগের জন্য এমটিএ এবং ওয়েবসাইটের যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে তাও বন্ধুদের জানানো উচিত। অনেক সময় বন্ধুদের সাথে বসে সেগুলো দেখার সুযোগ হয়। বন্ধু-বান্ধবদেরও এ সম্পর্কে বলা উচিত বা পরিচিত করানো উচিত। আমার কাছে এখনও এমন অনেক পত্র আসে যাতে মানুষ লিখে, যখন থেকে এমটিএ'তে অন্ততঃপক্ষে রীতিমত খুতবা শুনতে আরম্ভ করেছি তখন থেকে জামাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছে এবং আমাদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করছে।

অতএব আজকাল এমটিএ এবং অনুরূপভাবে জামা'তি 'আল্ ইসলাম' যে ওয়েবসাইট রয়েছে, এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম আর সব আহমদীর তরবীয়ত এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম। অতএব সব আহমদীরই উচিত এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা।

অনেকেই আত্মসংশোধনের বাসনা রাখে, আর ইসলামী আদেশ-নিষেধ মেনে চলার আগ্রহ রাখে,বিশেষ করে চায় রীতিমত নামায পড়ার সুযোগ যেন হয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা এমন মানুষের সাহচর্যে এসে যায় যারা অলস, এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরাও নামাযের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আলস্যের শিকার হয় আর অবচেতন মনেই এমনটি ঘটতে থাকে। অতএব বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের

আজকাল এমটিএ এবং অনুরূপভাবে জামা'তি 'আল্ ইসলাম' যে ওয়েবসাইট রয়েছে, এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম আর সব আহমদীর তরবীয়ত এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম। অতএব সব আহমদীরই উচিত এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা।

বন্ধু-বান্ধবদেরও এ সম্পর্কে বলা উচিত বা পরিচিত করানো উচিত।

জন্য এমন মানুষ খুঁজে বের করা উচিত, যাদের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত। যারা রীতিমত নামায পড়ে বা নামাযে অভ্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেখানে একটি ছোট জায়গায় আহমদীদের অনেক ঘন বসতি রয়েছে। এছাড়া সেখানকার মসজিদগুলোর একটি থেকে অন্যটি স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। তাই তাদের মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা উচিত। অনুরূপভাবে অনেকেই এমন আছে যারা জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী রাখে, তাদেরকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। অনেক সময় মানুষ যখন বাহির থেকে সেখানে যায় তারা এ সম্পর্কে আমাকেও লিখে আর অভিযোগও করে যে, রাবওয়ার লোকদেরও যথাযথভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব রাবওয়ার নাগরিকদের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। যারা দুর্বল রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে জামাতের সাথে যাদের সম্পর্ক দৃঢ় এবং যারা রীতিমত নামাযও পড়ে তাদের প্রভাব গ্রহণ করা উচিত। বন্ধু-বান্ধব মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে আর বুদ্ধিমান কীভাবে বুঝতে পারে যে, আমার ওপর অন্যের প্রভাব পড়ছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার জালিনুস বা গ্যালেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন এক উন্মাদ ব্যক্তি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। যখন সে জালীনুসকে ছাড়ে তখন তিনি বলেন, আমার রক্তমক্ষণ কর অর্থাৎ রগ ছিদ্র করে তা থেকে রক্ত বের কর। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি রক্তমক্ষণ কেন করাতে চান? তিনি বলেন, এই উন্মাদ যে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে তাথেকে বোধ করি আমার ভেতরও উন্মাদনার কোন ব্যাধি রয়েছে কেননা; সে অন্যদের বাদ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার মাঝেও উন্মাদনার কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সাথে এই উন্মাদ নিজের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছে, যেকারণে সে আমার দিকেই ছুটে এসেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন লোকদের পিছনে চলা যারা নামাযী নয় আর তাদের পেছনে চলা যারা নামাযে অলস, এটি স্পষ্ট করে যে, অলসদের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য রয়েছে। (খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)

অতএব মোটের ওপর আহমদীদের অলসদের সাথে যোগাযোগ রাখার পরিবর্তে জামাতের মাঝে যারা সক্রিয়, কর্মঠ এবং আন্তরিক তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত বা তাদর সাথে মিল বা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা উচিত। আর এই সামঞ্জস্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মশক্তিতে বলীয়ান লোকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে যারা অলস আছে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে এক ব্যক্তি আসে এবং বলে, আমি নিদর্শন দেখতে চাই, আমাকে যদি অমুক নিদর্শন দেখানো হয় তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে তাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কোন ভেলকিবাজ নন, তিনি কোন তামাশা দেখান না বরং তাঁর প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি আমাকে বলুন, পূর্বে যেসব নির্দশন দেখানো হয়েছে সেগুলোকে আপনি কতটা কাজে লাগিয়েছেন যে, এখন আপনার জন্য আবার নতুন নিদর্শন দেখাতে হবে। কিন্তু মানব প্রকৃতির দুর্বলতা একে অপছন্দ করে বরং এটিকে সে সভ্যতা বিবর্জিত আচরণ মনে করে। সে মনে করে, আলস্য এবং উদাসীনতায় নিপতিত থাকা বৈধ বরং সে স্থায়ীভাবে এই অবস্থায়ই নিপতিত থাকতে চায়। সে এটি চায় না যে, কেউ তাকে এই প্রশ্ন করুক যে, সে নিজের দায়িত্ব কতটা পালন করেছে? কিন্তু তার দাবি হলো সে যখন কোন তামাশা দেখতে চায় তখন তাকে যেন তা দেখানো হয়। (আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড ১৪, পৃ. ২২৭-২২৮)

কাজেই এই হলো মানব প্রকৃতি। নাছোড় বা হঠকারীদের মাখে এমন আচরণ চিরাচরিতভাবেই চলে আসছে। না মানার হলে তারা শয়তানের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। সব নবীকে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, এমনকি মহানবী (সা.)-কেও। অস্বীকারকারীরা তাঁর কাছে এরূপ দাবি-দাওয়াই পেশ করেছে। যেমন স্বর্ণের ঘরের মু'জিযা দেখান, আকাশে আরোহণের নিদর্শন দেখান, শুধু তাই নয় বরং আকাশ থেকে আমাদের সামনে কোন গ্রন্থ নিয়ে আসুন, আর এভাবে আরো আজেবাজে প্রশ্ন করতে থাকে। অতএব খোদা তা'লা এমন অহেতুক দাবি-দাওয়াকে কোন গুরুত্বই দেন না আর তাঁর নবীরাও এগুলোকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেন না। অগণিত নিদর্শন রয়েছে, মানতে হলে একজন নেক প্রকৃতির মানুষের জন্য তাই যথেষ্ট।

কতিপয় ব্যক্তি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে কিছু আপত্তি করে যে, এটি আবার কোন্ নতুন স্কীম চালু করা হলো। এর উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, সত্যিকার অর্থে আমার এই তাহরীকে জাদীদের তাহরীক নতুন কোন তাহরীক নয় বরং এটি একটি প্রাচীন তাহরীক।আর জাদীদ বা আধুনিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেসব পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং রোগাক্রান্ত মস্তিষ্কের মোকাবিলা করা হয়েছে যারা জাদীদ বা আধুনিক ছাড়া অন্য কোন কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। যেভাবে ডাক্তার যদি দীর্ঘদিন ধরে কোন রোগীর চিকিৎসা করতে থাকে, রোগী অনেক সময় বলে বসে, এই ঔষধে আমার কোন কাজ হয় না। তখন ডাক্তার বলেন, আজ আমি তোমাকে নতুন ঔষধ দিচ্ছি। এটি বলে পূর্বের ঔষধে অন্য কিছু মিশিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি (রা.) সে যুগের কথা বলেন যখন টিংচার কার্ডিমাম মিশিয়ে কিছু ঔষধকে

বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের জন্য এমন মানুষ খুঁজে বের করা উচিত, যাদের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত। যারা রীতিমত নামায পড়ে বা নামাযে অভ্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

যারা দুর্বল রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে জামাতের সাথে যাদের সম্পর্ক দৃঢ় এবং যারা রীতিমত নামাযও পড়ে তাদের প্রভাব গ্রহণ করা উচিত।

সুগন্ধিযুক্ত করে তোলা হতো, আর রোগী মনে করতো, আমাকে নতুন ঔষধ দেয়া হয়েছে। আর ডাক্তারও নতুন ঔষধ শব্দটি ব্যবহারের অধিকার রাখত কেননা; সে ঔষধের সাথে আরেকটি ঔষধ মিশিয়ে এমনটি করতো। কিন্তু এটিকে সে নতুন বানায় এজন্য যাতে রোগী তা পান করা অব্যাহত রাখে এবং সে যেন নিরাশ না হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একজন বৃদ্ধা আসেন, তার দীর্ঘদিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, কোনভাবেই সেই জ্বর নামছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তুমি কুইনিন খাও। সেই মহিলা বলে, কুইনিন? আমি তো কুইনিন ট্যাবলেটের এক চতুর্থাংশ খেলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ জ্বরে ভুগতে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দেখলেন, এই মহিলা কুইনিন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় তখন তিনি তাকে খাওয়ার জন্য কুইনিনই দেন কিন্তু বলেন, এটি দ্বারাইন এর ট্যাবলেট, এটি খাও। আমাদের দেশে যেহেতু সচরাচর কুইনিনকে কোনাইন বলে আর কোনাইন শব্দের অর্থ হলো, দু'জগৎ বা দ্বারাইন অর্থাৎ ইহ এবং পর জগৎ। কোনাইন এবং দ্বারাইন উভয় শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ দু'জগৎ। এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা বলেননি যে, এটি কুইনিন নয় বরং তিনি শুধু এর নতুন নাম রেখেছেন। সেই মহিলা হয়তো দু'তিনটি ট্যাবলেটই খেয়ে থাকবে আর এসে বলে, এই ঔষধে আমার জ্বর নেমে গেছে। আমাকে আরো কিছু ট্যাবলেট দিন। অথচ পূর্বে সে বলতো, অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ট্যাবলেটও যদি খাই শরীর গরম হয়ে যায় জ্বর নামে না। অথচ এখন নাম পরিবর্তন করে দিতেই শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে অর্থাৎ সব জ্বর উধাও হয়ে গেছে।

তিনি (রা.) বলেন, আমিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মত পুরনো এক তাহরীকের নাম তাহরীকে জাদীদ রেখেছি আর তোমরা বলছো, জাদীদ কেন রাখা হল বা নতুন করে তাহরীকের প্রয়োজন কি? আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি যাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা নতুন তাহরীকের কথা শুনে বলে, আস এটি একটি নতুন তাহরীক, চল আমরা এথেকে উপকৃত হই। কিন্তু যাদের মাঝে কপটতা ও মুনাফিকাত ছিল তারা একে নুতন জিনিষ মনে করে বলতে আরম্ভ করে, ইনি এখন নতুন নতুন কথা আবিষ্কার করছেন আর মুহাম্মদ (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। এরা কথা বুঝার চেষ্টা করেনি আর লাভবানও হয়নি। (আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড ১৪, পৃ. ২৩০-২৩১)

অতএব এটি এক রীতি যা সব সময় বা আদি থেকে অর্থাৎ আদমের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। অর্থাৎ শয়তান যখন তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তখন শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোমাকে পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। শয়তানকে এড়িয়ে ধর্মের কাজে উন্নতির জন্য যখনই কোন পন্থা বের করা হয় তা আসলে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে যেই উদ্দেশ্যে নবীরা এসেছেন আর যে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) এসেছেন আর যার জন্য এ যুগে তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন।

যেকোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর জামাতের সামগ্রিক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে যেতে হয় তা তরবীয়তের কাজ হোক বা অন্য যেকোন কাজই হোক না কেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক ফকির ছিল যে প্রায় সময় সেই কক্ষের সামনে বসে থাকতো যেখানে পূর্বে হিসাবরক্ষকের অফিস ছিল। আহমদীয়া চক থেকে কোন ব্যক্তিকে আসতে দেখলেই সে বলতো, এক রুপি দাও। সেই ব্যক্তি কিছুটা এগিয়ে আসলে সে বলতো, আট আনা দাও। এরপর আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সে বলতো, আচ্ছা চার আনা দাও বা সিকি দাও। এরপর তার সামনে এসে গেলে বলতো, দুই আনাই দাও। এরপর তাকে অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো, এক আনা দিলেও চলবে। আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো, অন্ততঃপক্ষে এক পয়সাই দাও। আরো কিছুদূর গেলে বলতো, আধা পয়সাই দাও। সেই ব্যক্তি মসজিদে আক্সার মোড়ে পৌছে গেলে বলতো একটি পাকোড়াই দিয়ে দাও। এরপর সে যখন দেখতো, গলির শেষ মাথায় পৌছে গেছে তখন বলতো, নিদেনপক্ষে একটা মরিচই দাও। সে রুপি থেকে আরম্ভ করে মরিচে এসে শেষ করত।

অনুরূপভাবে, যারা কাজ করে বা যারা কর্মী তাদেরও একথা ভাবা উচিত যে, অন্যূন কিছু তো হস্তগত হওয়া চাই। প্রথমে শ' এর ভেতর যদি একজন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে পরের বার দু'জন হয়ে যাবে, এর পরের বার চার হবে আর এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অতএব কাজ কর এরপর ফলাফল দেখ। জাগতিক কাজকর্ম যেখানে ফলাফল শূন্য হয় না সেখানে এটি কীভাবে ভাবা যেতে পারে যে, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কাজ ফলাফল শূন্য থেকে যাবে? কিন্তু যাদের হৃদয় পরিষ্কার হয় না তারা বলে, আমরা কাজ করি কিন্তু ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে। ফলাফল অবশ্যই আল্লাহ্‌র হাতে মর্মে তাদের কথার অর্থ হলো, আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পুরো পরিশ্রম করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি শত্রুতা করেছেন। একথা বলা কত বড় নির্বুদ্ধিতা। এটি নিজেদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য খোদা তা'লাকে দায়ী করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার নিয়ম হলো, আমরা যে কাজ করি সেই কাজের কোন না কোন ফলাফল অবশ্যই প্রকাশ পায়। কিন্তু ফলাফল ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে আমাদের নিজেদের কাজের ওপর। কোন ব্যক্তি এক দশমাংশ পরিশ্রম করলে প্রকৃতির আইন হলো, তার ফলাফলও এক দশমাংশই

প্রকাশ পাবে। এখানে দশমাংশের অর্থ এটি নয় পরিশ্রম তো সে বেশি করেছিল কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের কারণে এমনটি হয়েছে! প্রকৃতির নিয়ম কারো পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেয় না কিন্তু দুস্কৃতকারী ব্যক্তি বলে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেননি আর ভুলে গেছেন! এর চেয়ে বড় কুফরী বাক্য আর কি হতে পারে? অতএব শ্রম ও সাধনার যতটুকু সম্পর্ক আছে ফলাফল আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে। ফলাফল যদি ভালো না হয় তাহলে নিশ্চিত হতে পার যে, আমাদের কাজে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। চেষ্টা করা উচিত, যেন সব কাজের ফলাফল সুনির্দিষ্ট রূপে আমাদের সামনে প্রকাশ পায়। ফলাফল যতদিন প্রকাশ না পায় ততদিন আমাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। (আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড ১৮, পৃ. ২০১-২০২)

কতিপয় মানুষ লিখে, আমরা অনেক ইবাদত করেছি, অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয়নি, দোয়া গৃহীত হয়নি। তাদেরও একথা বুঝতে হবে যে, যতটা যাওয়া উচিত ছিল তারা হয়তো সেখানে পৌঁছেনি বা গন্তব্য নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তারা ভুল রাস্তা বেছে নিয়েছে। একজন দোয়াকারী ব্যক্তির এটি নিয়ে ভাবা উচিত যে, রাস্তাও যেন সঠিক হয় আর পরিশ্রম যতটা করা প্রয়োজন তাও যেন করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একজন মধ্যযুগীয় রসায়নবিদ যখন ব্যর্থ হয় তখন সে বলে, এক লাইন বা এক বিন্দুর ঘাটতি রয়ে গেছে অর্থাৎ মহামূল্য ধাতু বানাতে পারার বিষয়ে সে নিরাশ হয় না বরং নিজের দুর্বলতার কথাই স্বীকার করে অথচ এক্ষেত্রে সাফল্য লাভের কোন আশা দূরাশা মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে তো সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের পুরো আশা থাকে। একজন আলকেমিস্ট বা মধ্যযুগীয় রসায়নবিদ যার সারাটি জীবন সামান্য ঘাটতি বা ভুল-ত্রুটির সংশোধনের চেষ্টায় কেটে যায়, সে কখনও সফলতার বিষয়ে নিরাশ হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্য চায় আর সফলতা পায় না সে এর জন্য নিজের কর্মপন্থার ত্রুটিকে দায়ী করে না বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিরাশ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। অতএব, মধ্য যুগের এক রসায়নবিদ ভুল-ত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, স্বর্ণ বানাতে অবশ্যই সে সক্ষম হবে কিন্তু আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা যে করে, সে নিজের ভুল-ভ্রান্তিকে খোদার প্রতি আরোপ করে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দেয়। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ১১, পৃ. ৬০)

অধুনা গবেষকদের অবস্থাও একই, বছরের পর বছর একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য গবেষণা করে, বছরের পর বছর তাতে ব্যয় করে এবং বহু বছর পর তাতে সাফল্য আসে। আর তাতেও যে রীতি তারা একবার অবলম্বন করে সর্বদা সেই রীতিই অবলম্বন করা আবশ্যক নয়, বিভিন্ন গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করা হয়। অতএব আধ্যাত্মিকতা অর্জন এবং খোদার নৈকট্য লাভ আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য নিজের রীতি এবং পন্থা দেখতে হবে। আত্মসংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কীভাবে আত্মসংশোধন করা হচ্ছে। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে। নিজের ইবাদতের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। খোদা তা'লার সকল আদেশ নিষেধ অনুসারে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। নিজের প্রতিটি কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমাদের কর্মের মান কেমন? নিজেদের চিন্তাধারা এবং যুক্তি-বুদ্ধির সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলেন, আমি বান্দার কাছে অবস্থান করি এবং তাদের দোয়া গ্রহণ করি, তারপরও যদি তিনি কাছে না আসেন আর দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে কোন না কোন ক্ষেত্রে বা কোন স্থানে অবশ্যই আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি আছে এবং ব্যবহারিক অবস্থায় কোন দুর্বলতা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, ফকির বা ভিক্ষুক দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ফকির হলো 'নরগাদা' আর দ্বিতীয় প্রকার ফকির হলো 'খরগাদা'। 'নরগাদা' ফকির হলো সে, যে কারো দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে যে, কিছু দাও। তখন কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করে আর না দিলে দু'তিন বার ডেকে চলে যায়। কিন্তু 'খরগাদা' ফকির সে, যে যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সেখান থেকে সরে না নড়েও না। এমন ফকির কিছু না নেয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না, কিন্তু এমন ফকির খুব কমই হয়ে থাকে।

আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বসে থাকত। সে ততক্ষণ উঠতো না যতক্ষণ কিছু হস্তগত না করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যতক্ষণ বাইরে এসে তাকে কিছু না দিতেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকত। অনেক সময় সে পয়সা নির্ধারণ করে বলতো, এত টাকা নিব। যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেয়ে কম দিতেন সে নিত না। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে, অতিথিরা তার উদ্দিষ্ট অংক তাকে দিয়ে দিত যেন সে চলে যায়।

তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি তার মুখ থেকে যদি এমন কোন কথা বের হতো যে এত টাকা নিব তাহলে যতক্ষণ সেটি পুরো না হত সে নড়তো না। হুযূর (আ.) অসুস্থ থাকলে সে ততক্ষণ যেত না যতক্ষণ হুযূর সুস্থ হয়ে বাইরে না আসতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, মানুষের 'খরগাদা' হওয়া অর্থাৎ খর-ফকির হওয়া আর চাওয়া অব্যাহত রাখা। আল্লাহ্‌র দরবারে ধরনা দিয়ে বসে থাকা আর বিচ্যুত না হওয়া যতক্ষণ খোদার কর্ম এটি প্রমাণ না করে যে, এখন এর জন্য দোয়া করা আর উচিত নয়। (খুতবাতে মাহমুদ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২০০)

এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয় মর্মে আল্লাহ্ তা'লার কর্ম কয়েকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক মহিলা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকে, আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এটি বোঝা যায় যে মেয়েসন্তান হতে যাচ্ছে নাকি ছেলেসন্তান। আর শেষ সময় এসে এটি পরিষ্কারভাবে বুঝায় যায়, ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। তখন একথা বলা যে, ছেলেই হোক, এটি খোদার কর্মের পরিপন্থী আচরণ, এটিতো জন্মের একান্ত পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ গর্ভকালের একেবারে শেষ সময়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যেন পরবর্তী গর্ভধারণে ছেলেসন্তান দান করেন এই মর্মে দোয়া গৃহীত হতে পারে। অথবা কখনও যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর এরপরও মানুষের পক্ষ থেকে বিপরীত দোয়া করতে থাকা ভ্রান্ত রীতি, এটি শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। কিন্তু এখানে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কখনো তদবীর বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। অবিচলতার সাথে চেষ্টা এবং দোয়া করে যাওয়া খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে, তাই চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে দোয়া একান্ত আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

বলতেন, দোয়ার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি। এমন ব্যক্তির দোয়া তার মুখে ছুড়ে মারা হয় যে কেবল দোয়া করে কিন্তু কোন চেষ্টা করে না। যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়াকে এক সাথে না রাখে তার দোয়া গৃহীত হয় না, কেননা দোয়ার সাথে চেষ্টা না করা খোদার আইন লঙ্ঘন করা এবং তাঁর পরীক্ষা নেয়ার নামান্তর। বান্দা আল্লাহ্‌র পরীক্ষা নিবে এটি খোদার মহিমা পরিপন্থী একটি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবিচলতার সাথে এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করে সকল বাহ্যিক উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর, আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি একজন শহীদের জানাযা। তিনি হলেন মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব, পিতার নাম জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, তিনি শেখুপুরা জেলার কোট আব্দুল মালেক নামক স্থানের অধিবাসী। গত ১লা মার্চ ২০১৬ তারিখে দুপুর প্রায় দেড়টার দিকে তাঁর ঘরের বাইরে ছুরিকাঘাত করে বিরোধিরা তাকে শহীদ করে, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। ঘটনার দিন শহীদ মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব ঘরের সাথে সন্নিবেশিত দোকান বন্ধ করে বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে আনার জন্য ঘর থেকে বের হতেই, দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার ওপর হামলা করে এবং তাকে টেনে-হিঁচড়ে গলিতে নিয়ে যায়। এক ব্যক্তি কামরুয্ যিয়া সাহেবকে চেপে ধরে আর দ্বিতীয় জন উপর্যুপুরি ছুরিকাঘাত করতে আরম্ভ করে। কামরুয্ যিয়া সাহেব আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন কিন্তু তার বুক, কাঁধ, হৃৎপিণ্ড এবং ঘাড়ে আঘাত আসে, একজন আক্রমণকারী পিছন থেকে ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করে আর ছুরি সেই অবস্থায় রেখেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তার বড় দাদা জনাব দৌলত খান সাহেবের মাধ্যমে আসে যিনি গুরুদাসপুর জেলার অলক বেরী থেকে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর রাবওয়ার বেহেশতী মকবেরায় তিনি সমাহিত হন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব ফাতেহ মোহাম্মদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জন্মগত আহমদী ছিলেন, তিনিও রাবওয়ার বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত রয়েছেন। দেশ বিভাগের পর এই পরিবারটি হিজরত করে শিয়ালকোটের কালী ক্যানাগরেতে বসতি স্থাপন করে। শহীদ মরহুম সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৫ সনে কোট আব্দুল মালেকে স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুম বানিজ্যে স্নাতক পর্যন্ত পড়ালিখা করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন চাকুরী করেন, তারপর ঘরের সাথে একটি দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন আর ফটোস্ট্যাট এবং মোবাইল ফোনের দোকান দেন। ২০০৪ সনে তিনি বিয়ে করেন। বহু গুণের আধার ছিলেন, নেক, ঈমানদার, উত্তম চরিত্র, পবিত্র স্বভাব, মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ এবং সৎসাহসী যুবক ছিলেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। জামাতের কাজেও সবসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পলন করেছেন, সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। শহীদের ভাই মাযহার আলী সাহেব বলেন, মোটের ওপর নামায, বিশেষ করে জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন। রীতিমত তাকে জুমুআ পড়তে দেখে অন্যান্য অ-আহমদী দোকানদারও জুমুআর দিন তাদের দোকান বন্ধ করে জুমুআর জন্য যেতো এবং বলতো, যদি এক মির্যায়ী জুমুআর সময় দোকান বন্ধ করে যেতে পারে তাহলে আমাদেরও যাওয়া উচিত। কোন সময় তিনি জুমুআর নামায এ কারণেও পরিত্যাগ করতেন না যে, আমার কারণে অ-আহমদীরাও জুমুআ পড়তে যায়।

তার স্ত্রী বলেন, গত মাস থেকে শহীদ মরহুমের আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, আর পূর্বের চেয়ে অধিক আমার যত্ন নিতে আরম্ভ করেন, কোন রূঢ়কথায়ও রাগ করতেন না। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন আর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদের পদে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জামাতী পদে তিনি কাজ করেছেন এবং জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। সকল জামাতী কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তিনি জামাতের কারণে অনেক দিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। এ সম্পর্কে পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছেলিখিত আবেদনও করা হয়েছে। ২০১২ সনের ১৪ই আগষ্ট প্রায় পাঁচশ' মানুষের একটি মিছিল পুলিশের নেতৃত্বে কামরুয্ যিয়া সাহেবের ঘরের বাহিরে সমবেত হয়, বিরোধীদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করে একজন পুলিশ তার দোকানের কাউন্টারে উঠে ছবি নামাতে আরম্ভ করে আর দোকানের সাটাঁরে লেখা **'ওয়াল্লাহু খায়রুর্ রাযেকীন'** এবং কলেমা তাইয়্যেবার ওপর আলকাতরা লেপন করে। পরে দোকানের দেয়ালে ঝুলন্ত **'আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহ্'** এবং **'মাশাআল্লাহ্'** খচিত বোর্ড হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঘরের বাইরের নেইমপ্লেট থেকে, যেখানে কামরুয্ যিয়া সাহেবের পিতার নাম মোহাম্মদ আলী লেখা ছিল, তা থেকে 'মোহাম্মদ' অংশটি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এই হল এদের অবস্থা। এটি দেখে **ইন্না লিল্লাহ্** পড়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

একইভাবে ২০১৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী ৪০/৫০ জন মৌলভীর একটি মিছিল কামরুয্ যিয়া সাহেবকে জোর করে দোকান থেকে বের করে সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত করা ছাড়াও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবির অবমাননা এবং অসম্মান করে, আর নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে থাকে, তখন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কামরুয্ যিয়া সাহেবকে থানায় নিয়ে যায় কিন্তু পরে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়েই বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়। এই হলো বিরোধিতার চিত্র এবং অবস্থা। তাকে সব সময়ই হুমকি দেয়া হতো, আর এ কারণে তার বহিঃর্বিশ্বে চলে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন।

শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'ভাই এবং দু'বোন, পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, স্ত্রী রুবী কুমর সাহেবা ছাড়াও তিনজন সন্তান হুযায়ফা আহমদ,আমাতুল মতিন এবং আরেক কন্যা আমাতুল হাদী রেখে গেছেন যাদের বয়স যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৪ বছর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই শহীদ ভাইয়ের মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে তার মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করা অব্যাহত রাখুন এবং জান্নাতের নিয়ামতে তাদেরকে ভূষিত করুন আর তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে স্থান দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে
অনুদিত

জুমুআর খুতবা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-এর জীবনচরিত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে গভীর ভালোবাসা এবং প্রেমময় সম্পর্ক** ছিল, তা প্রত্যেক সেই আহমদী জানে, যে তার সম্পর্কে কিছুটা পড়েছে বা শুনেছে। সম্পূর্ণভাবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের প্রকৃত কোন দৃষ্টান্ত যদি দেয়া যায়, তবে তা হযরত হেকীম নূরউদ্দীন (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর আনুগত্যের পরম উন্নত মার্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন আর এতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার উদাহরণযদি দেয়া যায়, তবে তাহযরত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.)। বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায়, সেই দায়িত্ব পালন করতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে জাগতিক সকল আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে বেশি দৃঢ় সম্পর্ক-বন্ধন কেউ যদি রচনা করে থাকেন, তাহলে

এর সবচেয়ে মহান দৃষ্টান্ত হলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। সেবক-সুলভ অবস্থার অনন্য এবং অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যদি কেউ স্থাপন করে থাকেন, তাহলে সত্যিকার অর্থে তা-ও করেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে বিনয়া প্রদর্শনেরপরম মার্গে যদি কেউ **আমাদের চোখে পড়ে, তাহলে জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে সেই উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)**। এছাড়া যুগ ইমাম হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি সেই সম্মান লাভ করেছেন, যা অন্য কেউ লাভ করতে পারেনি। তিনি (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ, কতইনা ভালো হতো, যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো। (নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১১)

অতএব, এটি এক অতুলনীয় সাধুবাদ, বিরল এক সম্মান অর্থাৎ যুগ ইমাম তাঁর অনুসারীদের জন্য হযরত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.)-কে সবকিছুর আদর্শ মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, সবাই যদি নূরউদ্দীন হয়ে যায় তাহলে এক বিপ্লব সাধিত হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.), হযরত হেকীম মওলানা নূরউদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা পাঠ করে মনিব-ভৃত্য, গুরু-শিষ্যের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত সামনে আসে আর সেই সাথে বিনয়, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ত্যাগের মান এবং আনুগত্যের সুমহান দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার তিনিকাদিয়ান এলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনার সম্পর্কে আমার প্রতিএলহাম হয়েছে, 'আপনিযদি আপনার পৈত্রিক নিবাসে ফিরে যান, তাহলে আপনার সম্মান হারাবেন।' এরপর তিনি (রা.) পৈত্রিক নিবাসে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। যদিও তখন তিনি তার গ্রাম ভেরাতে এক জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ভেরা গিয়ে আমিও সেই ঘরটি দেখেছি, যাতে তিনিবিশাল একটি কক্ষ বানাচ্ছিলেন, যেন তিনি সেখানে বসে দরস এবং চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বর্তমান যুগের নিরিখে, [অর্থাৎ যে যুগে যখন খলীফা সানী (রা.) একথা বর্ণনা করছেন,] সেই ঘর আহামরি তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু যে যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তখন জামা'তের কাছে খুব বেশি অর্থ-সম্পদ ছিল না আর সে সময় এমন ঘর নির্মাণ করা সবার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তথাপি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ শোনার পর তিনি (রা.) ফিরে ওই ঘরের প্রতি তাকিয়েও দেখেন নি। যদিও কোন কোন বন্ধু বলেছিলেন, একবার গিয়ে ওই ঘরটি দেখে আসুন। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার জন্য সেই ঘর যেহেতু ছেড়ে দিয়েছি, তাই এখন আমার এটি দেখার আর প্রয়োজনই বা কি? (মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী ১৯৫৬, আনওয়ারুল উলুম, ২৫তম খণ্ড, পৃ, ৪১৯-৪২০)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আঞ্জুমানের কতিপয় হর্তাকর্তা নিজেদেরকে একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবতে আরম্ভ করে আর জাগতিকতা তাদের উপর ভর করছিল। তখন আঞ্জুমানে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মতামতে মিল থাকত আর অন্যান্য বড় বড় নেতৃ-স্থানীয় হর্তাকর্তাদের মতামত ভিন্ন হতো। যাহোক, **এমনই এক উপলক্ষে তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল বন্ধ করা-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আঞ্জুমানে উত্থাপিত হয়**। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মতামতও তাই ছিল। অর্থাৎ, এটি বন্ধ করা সমীচীন হবে না। এই ঘটনা নিয়ে চরম বিতর্ক চলছিল আর অবশেষে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দরবারে পেশ হওয়ার ছিল। এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় কেউ কেউ এই স্কুলকে ভেঙ্গে শুধু আরবীর একটি মাদ্রাসা চলমান রাখার পক্ষে ছিল। কেননা, দু'টো স্কুল চালানোর মতো সাধ্য জামা'তের তখন ছিল না আর এ সিদ্ধান্তের পক্ষের দলটি বেশ ভারী ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি শুধু দেড় ব্যক্তিই স্কুলের পক্ষে ছিল, যাদের একজন ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আর আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে, আমি অর্ধেক ছিলাম। কারণ, তখন আমি এক বালক ছিলাম। কিন্তু আমি মনে করি, স্কুল সম্পর্কে যেই আবেগ এবং উচ্ছাস তখন আমার ভেতর ছিল, তা ছিল উন্মাদনার সীমায় উপনীত। আর শ্রদ্ধাবোধের কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে বেশি কথা বলতে পারতেন না, তাই তিনি আমাকে তার কথা পৌঁছানোর মাধ্যম বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে তার মতামত জানিয়ে দিতেন আর আমি তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পৌঁছে দিতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাফল্য দান করেন। যদিও কোন কোন ত্বরাপরায়ণ বন্ধু আমাদের উপর প্রায় কুফরী ফতওয়া আরোপ করার পর্যায়ে ছিল, অর্থাৎ- এই স্কুল যদি বন্ধ করা না হয়, তাহলে তোমরা কুফরী করছ এবং একথাও বলে যে, এরা দুনিয়াদার। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কেও বলে, এরা দুনিয়াদার। কেননা, এরা ইংরেজী শিক্ষার সমর্থক। কিন্তু তাসত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের পক্ষেই রায় দেন। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮১)

স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ঘটনার মাধ্যমে, অর্থাৎ-স্কুল চালু রাখা বা বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি ছাড়াও **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথা বলার সময়কার ভদ্রতা ও সম্মানবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়**। তাঁর মানসপটে হয়ত একথাও থাকবে যে, কোথাও কোন বিষয় উপস্থাপনের সময় অত্যুৎসাহে এমন কথা না মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মান পরিপন্থী হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অন্তর্দৃষ্টির কথা তাঁর ঈমানের কথা এবংজাতিগঠনের নীতির কথাউল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জাতি গঠিত হয় ব্যক্তির সমন্বয়ে আর জাতির মাধ্যমে ব্যক্তি উন্নতি করে। উন্নত চিন্তা-ধারার মানুষ, বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষরা জাতির প্রভূত উপকার করে থাকে। মহান এবং উন্নত উদ্দেশ্যাবলী যখন পুণ্যবান ও

মেধাবী মানুষের হাতে আসে, তখন তা অনেক বেশি উপকারী বা কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন সে জামাত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে) তাঁর (আ.) সাথেও আল্লাহ্ তা'লা একই ব্যবহার করেছেন। তাঁর দাবির প্রারম্ভেই কতিপয় এমন ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, যারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং দক্ষতার নিরিখে সর্বোত্তম সেবা প্রদানকারী ছিলেন আর যে দায়িত্ব খোদা তা'লা তাঁর উপর ন্যস্ত করেছেন, সেই কাজে তাঁর সাহায্যকারী ও সহায়ক ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা দেখেছি, সত্যিকার অর্থে তাঁরাই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও সহায়ক প্রমাণিত হয়েছেন।

নবুয়্যতের দাবি করার পূর্বেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মনোযোগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নিবদ্ধ হয় আর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মসীহ্ বা ঈসা হওয়ার দাবি করেন, তখন নবুয়্যত সংক্রান্ত কিছু বিষয়াদি তাঁর প্রারম্ভিক পুস্তিকা 'ফতেহ্ ইসলাম' এবং 'তৌযীহে মরাম'-এ বর্ণনা করেন। **এক ব্যক্তি, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি কুধারণা রাখতো, কোনভাবে এই দু'টো পুস্তিকার পান্ডুলিপি তার দৃষ্টিগোচর হয়,** ছাপাখানায় মুদ্রণের সময় হয়ত দেখে।সেই ব্যক্তি জম্মু যায় এবং বলে, আজকে আমি মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবকে মির্যা সাহেবের খপ্পর থেকে মুক্ত করব। ইতোমধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঈসা হওয়ার দাবি করেছেন 'ফতেহ্ ইসলাম' এবং 'তৌযীহে মরাম'-এর ছাপার যুগে, যা বয়আতের ঘটনার প্রায় দু'বছর পর হয়েছে। এই দু'টো পুস্তিকায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবুয়্যতের ধারা যে চলমান আছে, তা যুক্তি-প্রমাণের আলোকে উত্থাপন করেন। সে ব্যক্তি, তাঁর (আ.) পুস্তিকায় নবুয়্যতের ধারা চলমান থাকা সংক্রান্ত বিষয় পাঠ করে বললো, এখন তো অবশ্যই মৌলভী নূরউদ্দীন মির্যা সাহেবকে পরিত্যাগ করবেন। কেননা, মৌলভী নূরউদ্দীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তিনি যখন শুনবেন, মির্যা সাহেব বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর পরও নবী আসতে পারেন, তখন তিনি আর মির্যা সাহেবের মুরীদ থাকবেন না। এই ব্যক্তি আরো কিছু লোক জড়ো করে আর ধীরে-ধীরে হেলে-দুলে তাঁর কাছে যায়। তাঁর (রা.) কাছে পৌঁছে সে হযরত মৌলভী সাহেবকে বলে, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি (রা.) বলেন, বলুন কী জিজ্ঞেস করতে চান। সে ব্যক্তি বলে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এ যুগের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুয়্যতের ধারা অব্যাহত আছে– তাহলে আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলবেন? সেই ব্যক্তি ভেবেছিল, আমি এক মৌলভীর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু সে জানতো না যে, সে এক মৌলভীর কাছে নয় বরং এমন এক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে, যার দ্বারা খোদা তা'লা নিজ জামা'তের কাজ নিতে চান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর মূলতঃ দাবিকারকের নিজের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে এই দাবির যোগ্যতা রাখে কি-না। যদি এই দাবিকারক সৎ না হয়, তাহলে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলব আর দাবিকারক যদি কোন সৎ মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আমরাই ভ্রান্ত, সত্যিকার অর্থে নবী আসতে পারেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, আমার এই উত্তর শোনার পর সেই ব্যক্তি তার সাঙ্গ-পাঙ্গকে বলে, চল! এই ব্যক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তার সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। তিনি (রা.) বলতেন, এরপর আমি তাকে বললাম, আসল ব্যাপার কি আমাকে একটু খুলে বল। সে বললো, আপনাদের মির্যা সাহেব দাবি করেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম নাযিল হয় আর আমি নবী-সদৃশ'। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার একথা শুনে বলেন, নিঃসন্দেহে মির্যা সাহেব যা কিছু লিখেছেন তা সত্য আর আমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। (খুতবাতে মাহমুদ, ২৮তম খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০)

একটি ঘটনা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে যা সরাসরি সম্পর্ক রাখে, আবার রাখেও না। এটি তাঁর (রা.) বোনের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা, যাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এক পীর সাহেবকে প্রশ্ন করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তার বোন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আগে থেকেই তিনি (বোন) কোন পীরের মুরীদ ছিলেন। সেই পীর বয়আতের পর তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে; বর্তমান যুগের পীরদের অবস্থাও একই। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বোন এক পীরের মুরীদ ছিলেন। তিনি কাদিয়ান আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। ফিরে যাওয়ার পর তার পীর সাহেব তাকে বলেন, তোর কি হলো যে, তুই মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করে এসেছিস? মনে হয় নূরউদ্দীন তোকে জাদু করেছে। ফিরে আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে তিনি একথা উল্লেখ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, পুনরায় পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হলে বলো, আপনার কর্মের জন্য আপনি দায়ী হবেন আর আমার আমলের জন্য আমি দায়ী হবো। আমি মির্যা সাহেবকে এজন্য মেনেছি যে যদি তাঁকে না মানি, তাহলে কিয়ামত দিবসে আমাকে জুতোপেটা করা হবে। এখন আপনি বলুন! আপনি সেদিন কি করবেন? তিনি ফিরে গিয়ে পীর সাহেবকে এই কথাই বলেন। পীর তখন বলে, এটি মনে হয় নূরউদ্দীনেরই দুষ্টামি। সে-ই তোমাকে একথা শিখিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কিয়ামত দিবস যখন আসবে এবং সব মানুষ পুল-সিরাতে সমবেত হবে, তখন তোমার পাপের বোঝা আমি বহন করবো, আর তুমি নাচতে নাচতে জান্নাতে চলে যেও। তিনি বলেন, পীর সাহেব! আমরা তো জান্নাতে চলে যাবো কিন্তু আপনার কি হবে? সেই পীর বলে, ফিরিশ্‌তা যখন আমার কাছে আসবে, তখন আমি তাকে রক্তিম চোখ দেখিয়ে বলবো, আমাদের নানা ইমাম হোসেনের শাহাদাত কি যথেষ্ট ছিল না যে, আজ কিয়ামত দিবসে আমাদেরকেও কষ্ট দেয়া হচ্ছে? একথা শুনে ফিরিশ্‌তা লজ্জিত হয়ে চলে যাবে আর আমরাও লাফিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব। (আল্ ফযল, ২৭ জুন ১৯৫৭, পৃ. ৩, খণ্ড ১১/৪৬, সংখ্যা ১৫২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সরলতা-সাধুতা আর আনুগত্যের কথা উল্লেখ

করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমরা স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখেছি। তিনি বৈঠকে একান্ত বিনয়ের সাথে দীনহীনের ন্যায় বসতেন। একবার এক বৈঠকে বা মজলিসে বিয়ে-শাদী বিষয়ক কথা হচ্ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডেপুটি মোহাম্মদ শরীফ সাহেব বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাঁটু মুড়ে বসে ছিলেন আর তাঁর অবনত মাথা ছিল হাঁটুর উপর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! জামা'ত বড় হওয়ার একটি উপায় হল, বেশি সন্তান-সন্ততি নেয়া, তাই আমার মনে হয় জামা'তের বন্ধুরা যদি একাধিক বিয়ে করে, তাহলে এর মাধ্যমেও জামা'তের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাঁটু থেকে মাথা তুলে বলেন, হুযূর! আমি তো আপনার নির্দেশ মানতে প্রস্তুত,কিন্তু এই বয়সে আমাকে কেউ মেয়ে দিতে সম্মত হবে না। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে উঠেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! এমন বিনয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই তিনি এই মর্যাদা পেয়েছেন। (আল্ ফযল, ২৭ মার্চ ১৯৫৭, পৃ. ৫, খণ্ড ১১/৪৬, সংখ্যা ৭৪)

আজকালও অনেক মানুষকে বিয়ের ব্যাপারে অতি-উৎসাহী দেখা যায়, কিন্তু এ কারণে নয়। যদি বৈধ কোন কারণ থেকে থাকে, তাহলে একাধিক বিয়ে করা বারণ নয়। কিন্তু কেউ কেউ পরিবার ধ্বংস করে আরেকটি বিয়ে করে থাকে। একাজ থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমনটি করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সংক্রান্ত একথা বলার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **তাঁর (রা.) সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ খিলাফত এবং জামা'ত সম্পর্কে ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ করেছে কিন্তু আজও জামা'ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে সম্মান করতে বাধ্য এবং তার জন্য দোয়া করে থাকে।** আর সেই বিনয় এবং ভালোবাসার কারণেই, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর ছিল, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ে তার প্রতি এই সম্মান-ও মাহত্ম সঞ্চার করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন। যদিও তাঁর কতিপয় সন্তান-সন্ততি ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের পিতার ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে উবে যায় না এবং আমরা তাকে দোয়ায় স্মরণ রাখি। আমরা দোয়া করি, খোদা তা'লা তাঁর (রা.) মর্যাদা উন্নীত করুন। কেননা, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তখন মেনেছেন যখন সারা পৃথিবী তাঁর (আ.) বিরোধী ছিল। অতএব, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা চিরস্থায়ী। (আল্ ফযল, ২৭ মার্চ ১৯৫৭, পৃ. ৫, খণ্ড ১১/৪৬, সংখ্যা ৭৪)

জামা'তের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির একটি উপায় হলো, বেশী বেশী সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করা। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একথাও বলেন, যা তাঁর নিজের সাথে বা হযরত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততির সাথে সম্পর্ক রাখ। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করতেন, অমুক ব্যক্তির ঘরে সন্তান-সন্ততি কতজন, কয় ভাই, এবং তাদের ক'জন সন্তান-সন্ততি রয়েছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, যে ঘরে বা বাড়িতে মিয়া বশীর আহমদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়, তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করেন, এ বংশে সন্তান-সন্ততি ক'জন? যখন তিনি জানতে পারলেন, সাত ছেলে রয়েছে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্য কোন কথা বিবেচনা করার পূর্বেই বলেন, খুব ভালো, এখানেই বিয়ে হওয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার এবং মিয়া বশীর আহমদ সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব এক সাথে দেয়া হয়। আমাদের উভয়ের বিয়ের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাই বলেছেন, খবর নেয়া উচিত, যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেই পরিবারে সন্তান-সন্ততি কতজন, কয় ছেলে, কয় ভাই। মোটকথা অন্যান্য কথার পাশাপাশি তিনি (আ.) 'ওলুদান'-কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ বেশী সন্তান-সন্ততি যে ঘরে হয় তাদের অগ্রগণ্য করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখনো অনেক মানুষ যখন আমার কাছে পরামর্শ চায়, তখন আমি বলি, দেখ! যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, সেই ঘরের সন্তান-সন্ততি ক'জন? (খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭)

আজকের বিশ্বে পরিবার-পরিকল্পনার উপর অনেক বেশি জোর দেয়া হয়। কিন্তু যেসব দেশে এর উপর অনেক জোর দেয়া হয়েছে, তাদের মাঝে এখন উত্তরোত্তর এই চেতনা দৃঢ়তর হচ্ছে যে, এটি একটি ভ্রান্ত রীতি। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখনই সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। চীন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নাগরিকদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে রেখেছিল, একাধিক সন্তান যেন না হয়, অন্যথায় জরিমানা করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে। আর এমন ঘটনাবলীও সেখানে ঘটেছে যে, মানুষ হয় সন্তান নষ্ট করেছে নয়তো জন্মের সময় শিশু সন্তানকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন তাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে, যার ফলে সেই নিষেধাজ্ঞা তারা প্রত্যাহার করেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশেও যেখানে এই বিধি-নিষেধ রয়েছে, বলা হচ্ছে, এটি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে এসব দেশে স্বল্পকাল পর জনশক্তি আর থাকবে না, কাজ করার জন্য মানুষ পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মের মাঝে এত বড় শূন্যতা দেখা দিবে যে, সেই শূন্যতা বিদেশীদের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে। এ কারণে এখন তারা এই নীতি পরিবর্তন করছে। মানুষ যদি খোদার আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় আর নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে, তাহলে এমন পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়। এখন তারা দুঃশ্চিন্তায় পড়েছে, আমাদের বিভিন্ন প্রজন্মের মাঝে এত বড় শূন্যতা দেখা দিবে যা পূরণ করা খুবই কঠিন হবে এবং জাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যাহোক, এটি কথা প্রসঙ্গে একটি কথা এলো, তাই বললাম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিনয় এবং সরলতা সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খিদমত বা সেবার জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হতো, খাবার রান্না করানোর প্রয়োজন হতো।সেই যুগের কথা হচ্ছে,যখন প্রথম দিকে অতিথিরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসতেন, বাজার ইত্যাদি করার প্রয়োজন হতো। স্পষ্টতই একাজ শুধু আমাদেরপরিবারের পক্ষে একা করা সম্ভব হতো না। তাই প্রায় সময় জামা'তের সদস্যরা মিলেমিশেই এই কাজ করতো। তখন নিয়মিত লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা ছিল না। জ্বালানি কাঠ আনা হলে গৃহকর্মী সজোরে

হাক দিয়ে ডাকত, লাকড়ী এসেছে, কেউ থাকলে আসুন আর জ্বালানি ভেতরে রেখে দিন। আগুন জ্বালানোর জন্য যেই লাকড়ি ইত্যাদি আসত, তার কথা বলা হচ্ছে। তখন পাঁচ-সাত জন মিলে জ্বালানি ভেতরে রেখে দিত। দু'তিন বার এমন হয়েছে, কাজের জন্য গৃহপরিচারিকার ডাকাডাকির পরেও কেউ আসে নি। একবার অতিথিশালার জন্য বেশ কিছু 'উপলা' অর্থাৎ, গোবরের জ্বালানি আসে। আকাশে মেঘ ছিল। গৃহপরিচারিকা জ্বালানি ভেতরে রাখার জন্য মানুষকে ডাকলেও তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মসজিদে আকসা থেকে কুরআনের দরস প্রদানের পর ফিরে আসছিলেন। তখন তিনি খলীফা ছিলেন না, কিন্তু ধর্মের জ্ঞান, তাকওয়া ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের সুবাদে জামা'তে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা ছিল। মানুষের উপর তাঁর সুগভীর প্রভাবও ছিল। দরস শেষে তিনি ঘরে ফিরছিলেন। গৃহকর্মী হাক ছেড়ে ডাকে, কেউ থাকলে আসুন, বৃষ্টি হতে যাচ্ছে, গোবরের জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রেখে দিন। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করে নি। তিনি (রা.) যখন দেখলেন, গৃহপরিচারিকার কথার প্রতি কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না বা কর্ণপাত করছে না, তখন তিনি (রা.) বলেন, ঠিক আছে, আজকে আমরাই কাজ করবো। একথা বলে তিনি গোবরের জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রাখতে আরম্ভ করেন। এখন এটি জানা কথা, এক ছাত্র যখন শিক্ষককে গোবরের জ্বালানি তুলতে দেখবে, তখন সেও শিক্ষকের সাথে একই কাজ আরম্ভ করবে। এই রীতি অনুসারে অন্যরাও যোগ দেয় এবং জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রাখতে আরম্ভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, দু'তিন বার আমি তাঁকে এমনটি করতে দেখেছি। যখনই তিনি এমনটি করতেন, অন্যরাও তাঁর (রা.) সাথে যোগ দিত। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩২৬-৩২৭)

এরপর **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, তার দৃষ্টান্ত** দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন অতিশয় আনন্দিত হতেন এবং ভালোবাসার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করতেন, তখন 'মির্যা' শব্দ ব্যবহার করতেন এবং বলতেন, 'আমাদের মির্যা'র অমুক কথা। প্রারম্ভিক যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কোন দাবিও করেন নি, তখন থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যেহেতু তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, তাই তখন থেকেই তিনি এই শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক নির্বোধ তখন আপত্তি করতো আর বলতো, হযরত মৌলভী সাহেবের হৃদয়ে নাউযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে মানুষ সচরাচর খলীফা আউয়াল (রা.)-কে মৌলভী সাহেব বা বড় মৌলভী সাহেব বলে সম্বোধন করতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি নিজেও মানুষের মুখে কয়েকবার এই আপত্তি শুনেছি এবং হযরত মৌলভী সাহেবকে এর উত্তরও দিতে শুনেছি। একবার এই মসজিদেই (অর্থাৎ মসজিদে আকসায়) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দরস দিচ্ছিলেন। দরস প্রদানকালে তিনি বলেন, অনেকেই আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখি না, অথচ আমি ভালোবাসার কারণে ও প্রেমের আতিশয্যে এই শব্দ ব্যবহার করি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যিক শব্দ দেখা উচিত নয়, বরং সেসব শব্দের পিছনে অন্তর্নিহিত যে উদ্দেশ্য থাকে, তা দেখা উচিত। (আল্ ফযল, ৩০ জুন ১৯৩৮, পৃ. ৩, ২৬তম খণ্ড, সংখ্যা ১৪৭)

দ্বিপাক্ষিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসার আরেকটি দৃষ্টান্ত তিনি (রা.) তুলে ধরেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কেমন ছিল, তা কারো অজানা নয়। তিনি (রা.) বলেন, তাঁর [অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর] দ্রুত হাঁটার অভ্যাস ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে যেতেন, তখন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সাথে থাকতেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দ্রুত হাঁটতেন, তখন খলীফা আউয়াল (রা.) গ্রামের বাইরে একটি বটবৃক্ষের তলায় বসে পড়তেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণ শেষে ফিরে আসতেন, তিনি (রা.) পুনরায় তাঁর সাথে যোগ দিতেন। কেউ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলেন, হযরত মৌলভী সাহেব ভ্রমণের জন্য যান না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তিনি তো প্রত্যেক দিনই যান। তখন তাঁকে বলা হয়, তিনি ভ্রমণের জন্য সাথে যাত্রা করেন ঠিকই, কিন্তু এরপর বটবৃক্ষের নিচে বসে পড়েন আবার ফেরার পথে সাথে যোগ দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরপর থেকে সব সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে ভ্রমণের সময় সাথে রাখতেন। তিনি যখন দ্রুত হাঁটতেন আর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) পিছিয়ে পড়তেন, তিনি (আ.) একটু দাঁড়িয়ে বলতেন, মৌলভী সাহেব! অমুক কথার অর্থ কী?

মৌলভী সাহেব তখন দ্রুত এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন এবং হাঁটতে আরম্ভ করতেন। এর স্বল্পক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় দ্রুত হেঁটে এগিয়ে যেতেন এবং কিছু দূর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং বলতেন মৌলভী সাহেব! অমুক কথাটি এমন। এভাবে ভ্রমণকালে বিভিন্ন আলোচনা হতো। মৌলভী সাহেব পুনরায় দ্রুত হেটে তাঁর (আ.) কাছে পৌঁছতেন আর দ্রুত হাঁটার কারণে তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে যেত।তবুও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে সাথেই রাখতেন। মৌলভী সাহেব প্রতিবারই ৩০/৪০ গজ করে পিছিয়ে পড়তেন আর মসীহ্ মওউদ (আ.) আবারও কোন কথা বলতে গিয়ে মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করতেন এবং তিনি দ্রুত হেঁটে এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমনটি করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মৌলভী সাহেবকে দ্রুত হাঁটতে অভ্যস্ত করা। দ্রুত হাঁটার অভ্যাস না থাকার কারণেই তাঁর গতি ছিল মন্থর। চিকিৎসা পেশা এমন যে, প্রায়শঃ মানুষকে বসে থাকতে হয়, বাহিরে কোন রোগী দেখতে যেতে হলেও বাহন প্রস্তুত থাকে। তাই, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দ্রুত হাঁটার অভ্যাস ছিল না। নতুবা তাঁর মাঝে যে পর্যায়ের আন্তরিকতা ছিল, সে সম্পর্কে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্‌য্ উম্মাত নূরে দী বূদে', অর্থাৎ উম্মতের সবাই যদি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। (তাহরীকে জাদীদ কে মাকাসাদ আওর উন কি আহমিয়্যত, আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৭)

আরেকটি দৃষ্টান্ত, যার মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায়, তা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার

নিজের চিকিৎসালয়ে বসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। হযরত মীর সাহেব সেখানে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন ভয়াবহ পেট ব্যথা হয় যে, ডাক্তাররা বলে, অপারেশন করানো আবশ্যক। কেউ কেউ বলে, ইউনানী ঔষধের মাধ্যমে অপারেশন ছাড়াও আরোগ্য লাভ হতে পারে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে টেলিগ্রাম পাঠান, যেই অবস্থায়-ই থাকুন না কেন চলে আসুন। তিনি যথাসম্ভব তখন ক্লিনিকে বসে ছিলেন, কোটও পরিহিত ছিলেন না আর সাথে টাকা-পয়সাও ছিলো না। তিনি খুব সম্ভব হাকীম গোলাম মোহাম্মদ মরহুম অমৃতসরীকে সাথে নিয়ে সেভাবেই যাত্রা করেন। হাকীম গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বলেন, আমি ঘর থেকে অর্থ-কড়ি নিয়ে আসি। কিন্তু তিনি বলেন, না। নির্দেশ হলো, যে অবস্থায়-ই থাকো, চলে আস। সবাই জানে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, ভালো হাঁটতে পারতেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে যেতেন, যেভাবে ঘটনা আমি শুনিয়েছি, তিনি পিছনে পড়ে থাকতেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেন, মৌলভী সাহেব কোথায় আছেন?আর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দ্রুতএসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন।এভাবে আবার পিছিয়ে পড়তেন, আবার মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। তিনি খুব সম্ভব হাকীম গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে পদব্রজে বাটালায় পৌঁছেন এবং বাটালা স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করেন। হাঁটার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন, কিন্তু যেহেতু নির্দেশ এসেছে, তাই সেভাবেই তখন হেঁটে বাটালা স্টেশনে পৌঁছে যান। দেখুন! **এই ছিল নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা। হাঁটতে তাঁর কষ্ট হতো, কিন্তু নির্দেশ পাওয়ার পর বাটালা পর্যন্ত প্রায় ১১ মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন।**

হাকীম সাহেব বলেন, ভাড়া ইত্যাদির কি হবে? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এখানে বস, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন। এটি খোদার উপর ভরসা করার দৃষ্টান্ত। তখন এক ব্যক্তি আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আপনি কি হাকীম নূরউদ্দীন সাহেব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সেই ব্যক্তি বলেন, এখনও গাড়ী আসতে ১০/১৫ মিনিট বাকি আছে। আমি স্টেশন মাষ্টারকে আপনার জন্য অপেক্ষা করার অনুরোধও করেছি। আমি বাটালার তহশীলদার। আমার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ, আপনি গিয়ে রোগিণীকে একটু দেখে আসুন। তিনি (রা.) যান আর রোগিণীকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন এবং স্টেশনে ফিরে আসেন। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ তহশীলদারও সাথে আসে এবং বলে, আপনি গিয়ে গাড়ীতে বসুন, আমি টিকেট নিয়ে আসছি। সে ব্যক্তি তখন সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাসের একটি করে টিকেট নিয়ে আসে আর একই সাথে পঞ্চাশ রূপী নগদ প্রদান করে এবং বলে, এটি তুচ্ছ হাদীয়া, গ্রহণ করুন।

এরপর তিনি (রা.) দিল্লী পৌঁছেন এবং গিয়ে মীর নাসের নওয়াব সাহেবের চিকিৎসা করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটিই সত্যিকার তাওয়াক্কুল বা খোদার উপর নির্ভরশীলতা। আল্লাহ্ তা'লা দেখেন, আমার বান্দা সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করে কি-না। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা হয়তো মানুষকে অনাহারেও রাখতে পারেন। পরীক্ষায় সব সময় বান্দার ইচ্ছানুসারে ঘটনা ঘটা আবশ্যক নয়। অনেক সময় পরীক্ষা হয়। মানুষকে অভুক্তও থাকতে হয়। মানুষকে বস্ত্রহীনও রাখতে পারেন। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিতে পারেন, যেন মানুষকে বলা যায়, আমার এই বান্দা আমার উপর নির্ভর করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অনেক সময় লেঙ্গুট বা নেংটি পড়তে হয়, কাপড় ছিড়ে টুকরো ঝুলতে থাকে এবং তাকে এভাবে উলঙ্গ দেখিয়ে অনেককে সাহায্য করার জন্য ইলহাম করেন। অনেককে আক্ষরিকভাবে ইলহাম করে সাহায্য করার নির্দেশ দেন আর কতককে তার অবস্থা দেখিয়ে সাহায্য করার জন্য অণুপ্রাণিত করেন। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল করে এবং আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করে, তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না। (আল্ ফযল, ৮ নভেম্বর ১৯৩৯, পৃ, ৬-৭, ২৭তম খণ্ড, সংখ্যা ২৫৬)

আল্লাহ্ তা'লা মানুষদের দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ করেন আর নিজেই ব্যবস্থা করেন।যারা খোদার উপর নির্ভর করে, তারা সাহায্যের জন্য কারো কাছে যায় না বরং, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের অভাব মোচনের জন্য মানুষকে পাঠান। এটি তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর নীর্ভর করার অনেক বড় একটি দৃষ্টান্ত, যেই পদমর্যাদায় তিনি (রা.) উপনীত ছিলেন।

অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে পদমর্যাদা ছিল, তা ছিল অতিব মহন এবং অনেক বড় পদমর্যাদা। তিনি আল্লাহ্‌র অনেক বড় ওলীউল্লাহ ছিলেন। কিন্তু এটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করো না বা এমন পর্যায়ে নিয়ে যেও না যেখানে অতিরঞ্জনের সীমা আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন,হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ একথা বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছে আর কোন কোন লাহোরীও এমনটি করে থাকে। কিন্তু লাহোরীরা তাঁর (রা.) ভালোবাসায় এমনটি করে না, বরং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা হলো তাদের উদ্দেশ্য। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সত্যের বহিঃপ্রকাশ থেকেও বিরত থাকা উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য প্রকাশ করেছেন আর তার (রা.) মর্যাদাকেও উন্নীত করেছেন। যেমন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু বকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কুরআন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য নাযিল হয় নি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামে কোথাও এ কথার উল্লেখ করা হয় নি যে, আমরা তোমাকে নূরউদ্দীনের সম্মান প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছি। তবে হ্যাঁ, যা সত্য ছিল, যা বাস্তবতা ছিল, তা তিনি (আ.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। যেমন, তিনি (আ.) বলেন,"চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্‌য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে" অর্থাৎ, কতইনা ভালো হতো, যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো। এটি একটি সত্য ও বাস্তবতা ছিল, যা বলা উচিত ছিল যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) অনেক বড় কুরবানী করেছেন।

এখন সেই কুরবানী বা ত্যাগের কথা না বলাটা অকৃতজ্ঞতার শামিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, একবার একজন রোগী আসে এবং বলে, আমি মৌলভী সাহেবের চিকিৎসা গ্রহণ করেছি, এতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেদিন অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু একথা শোনার পরই

তিনি উঠে বসেন এবং হযরত আম্মাজান (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই মৌলভী সাহেবকে অনুপ্রাণিত করে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখন সহস্র সহস্র মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। মৌলভী সাহেব যদি এখানে না আসতেন, তাহলে কীভাবে এই লোকদের চিকিৎসা হতো। অতএব, মৌলভী সাহেবের সত্ত্বাও খোদার অনেক বড় এক অনুগ্রহ। এই হলো কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি (আ.) কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন নি। (আল্ ফযল, ২ আগষ্ট ১৯৫৬, পৃ. ২, খণ্ড ১০/৪৫, সংখ্যা ১৭৯)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক সাহাবীর বরাতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বিনয়ের পরম মার্গের কথা উল্লেখ** করেন। তিনি (রা.) এক সাহাবীর ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে তিনি একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি মসজিদে মুবারকে বসেছিলেন, দরজার কাছে জুতা রাখা ছিল। সাদাসিধে পোশাক পরিহিত একজন মানুষ এসে জুতার কাছে বসেন। সেই সাহাবী বলেন, আমি ভাবলাম, এ হয়তো কোন জুতা চোর হবে।

তাই আমি আমার জুতার উপর নজর রাখি, সে আবার তা নিয়ে কোথাও পালিয়ে না যায়। তিনি বলেন, এর স্বল্পকাল পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইন্তেকাল করেন। আমি শুনেছি, তাঁর (আ.) জায়গায় অন্য এক ব্যক্তি খলীফা মনোনীত হয়েছেন। আমি বয়আতের জন্য আসি। বয়আতের জন্য হাত প্রসারিত করে আমি দেখি, ইনি সেই ব্যক্তি, যাকে অজ্ঞতাবশত আমি জুতা চোর ভেবেছিলাম [অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)]। আমি তখন মনে মনে খুবই লজ্জিত হই।

তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি জুতার কাছে এসে বসে পড়তেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ডাকলে তিনি কিছুটা এগিয়ে যেতেন। এরপর যখন তিনি (আ.) বলতেন, আজকে মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব আসেন নি? তখন তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেন। এভাবে বার বার বলার পর একটু একটু করে তিনি সামনে এগিয়ে যেতেন। এই সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বলতাম, এই মর্যাদা, যা তিনি অর্জন করেছেন তা এরূপ বিনয়ের মাধ্যমেই অর্জন করেছিলেন। (আল্ ফযল, ২৭ মার্চ ১৯৫৭, পৃ. ৫, খণ্ড ১১/৪৬, সংখ্যা ৭৪)

অতএব, এই ছিল তাঁর (রা.) বিনয়, সেই ব্যক্তির বিনয়, যিনি জ্ঞান এবং তত্ত্বদর্শনের পরম মার্গে উপনীত ছিলেন, যিনি ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে অসাধারণ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু এসব বিষয় তাঁকে আরো অধিক বিনয়ী করে তুলেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (রা.) পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন এবং **তাঁর নামে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন** আর আমাদেরকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছানুসারে এই নমুনা এবং এই আদর্শ থেকে শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন।

আজ মরিশাসের বার্ষিক জলসাও হচ্ছে। মরিশাসে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠারশত বছর পূর্ণ হয়েছে। তারা এ বছর নিজেদের শতবার্ষিকী (Centenary) উদ্‌যাপন করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই জলসা সকল অর্থে বরকতময় করুন আর জামা'ত প্রতিষ্ঠার এই শত বছর সেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নির্দেশিকা প্রমাণিত হোক, এটিই আমার দোয়া। তারা যেন নতুন নতুন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে। সেখানে কতিপয় নৈরাজ্যবাদীও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত থেকে জামা'তকে নিরাপদ রাখুন এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদের এই জলসা এবং অনুষ্ঠানমালাকে তিনি সার্বিকভাবে আশিসময় করুন।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪-১০ ডিসেম্বর ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা ৪৯, পৃ. ৫-৮)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২য় অংশের ১ম কিস্তি)

অতঃপর বলেন: **'ইন্না নাহ্‌ন নুহ্‌য়িল্ মৌতা ওয়া নাক্‌তুবু মা কাদ্দামু ওয়া আসারাহুম' অর্থাৎ 'আমরা কুরআন করীম দ্বারা মৃতদের জীবিত করছি'** (সূরাহ্ ইয়াসিন: ১৩)। আল্লাহ্ আরও বলেন: **ই'লামু আন্নাল্লাহা ইউহ্‌ইল্ আরযা বা'দা মওতিহা'** অর্থাৎ হে মানবকূল! জেনে রেখো, পৃথিবী মৃত হয়ে পড়েছিল। খোদা তা'লা এখন নতুনভাবে একে সঞ্জীবিত করেছেন' (সূরা আল হাদীদ)। মোটকথা, জায়গায় জায়গায় কুরআন করীমকে কিয়ামতের নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বরং একটি হাদীসেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ক্বিয়ামত আমিই বটে।' তিনি আরও বলেছেন: **'আল হাশিরুল্ লাযী ইউহ্‌শারুন্ নাস আলা কাদামী'** অর্থাৎ, 'আমিই কিয়ামত। আমার চরণ 'পরে মানুষ উত্থিত হয়ে থাকে।' অর্থাৎ 'আমার আগমনে মানুষ (আধ্যাত্মিকভাবে) জীবিত হচ্ছে। তাদের আমি কবর থেকে তুলে সঞ্জীবিত করছি এবং আমার চরণে জীবন লাভকারীগণ একত্রিভূত হয়ে চলছে।' বস্তুতঃপক্ষে আমরা যখন ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের জনপদগুলোর দিকে তাকাই, সেগুলো স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থার দিক দিয়ে দেখতে যে কীরূপ কবরস্থান বা শ্মশানের মতো হয়ে গিয়েছিল এবং কী পরিমাণে সততা ও সত্যতা এবং খোদাভীতিমূলক আবেগ-অনুভূতি তাদের ভিতর থেকে তিরোহিত হয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন রকম খারাপির দরুন তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও কাজকর্ম এবং আকিদা-বিশ্বাস প্রভৃতি সবই বিকারগ্রস্ত হয়ে পচে গলে গিয়েছিল, এ অবস্থা দৃষ্টে আমাদের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি প্রকাশ পায় যে, কলুষমুক্ত হয়ে এদের সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা মৃতদের দৈহিক ভাবে জীবিত হয়ে ওঠার চেয়ে নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে বহুগুণ বেশি বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হয়। এহেন মাহাত্ম্যপূর্ণ পরিবর্তন তাদের হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে।

এখন সারকথা হলো, উল্লিখিত আয়াতটির প্রকৃত অর্থ এটাই বটে, যা আমি তুলে ধরলাম। অর্থাৎ দৈহিকভাবে মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার (তথা কিয়ামতকালে পুনরুত্থিত হওয়ার) বিষয়ে বর্ণিত আধ্যাত্মিকভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার এহেন বাস্তবতাকে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেন যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। এতে করে অস্বীকারকারীরা (পবিত্র কুরআনের) এই নিদর্শনটি স্বীকার করে এবং মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে তারা ক্রমাগত বিশ্বাসী হয়ে চলেছে। বস্তুত গবেষকদের একটি দলও উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং **'মা'আলিম'** তফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ অর্থটিই লিপিবদ্ধ রয়েছে:

وقال الحسن وجماعة وانّه يعنى وان القراٰن لعلم للسّاعة يعلمكم قيامها ويخبركم باحوالها و اهوالها فلا تمترن بها يعنى فلا تشكن فيها بعد القران

(উচ্চারণ: "ওয়া ক্বালাল্ হাসানু ওয়া জামাতুন ওয়া ইন্নাহু ইয়া'নি ওয়া ইন্নাল কুরআনা লা-ইল্‌মুল্-লিস-সায়াতি ইউয়াল্লিমুকুম ক্বিয়ামাহা ও ইউখ্ বিরুকুম বি-আহ্‌ওয়ালিহা ওয়া আহ্‌ওয়ালিহা ফালা তাম্‌তারুন্নাবিহা ইয়া'নি ফালা তাশাক্কুন্না ফিহা বা'দাল কুরআন।" –অনুবাদক)। অর্থাৎ 'হাসান এবং একটি জামাত উল্লিখিত আয়াতটির এ অর্থই করেছেন যে, পবিত্র কুরআন কিয়ামতের সত্যতার সপক্ষে নিদর্শন বটে এবং কথায় ও ঘটনায় এ সংবাদ দিচ্ছে যে, কিয়ামত

এবং এর সহজাত সকল অবস্থা ও এর ভীতিকর নিদর্শনাবলী অবশ্য-অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব বাস্তবতা হলো সত্যিকার অর্থে কিয়ামত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যে তার প্রভাবশালী বর্ণনাসমূহ দ্বারা পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার সপক্ষে কার্যকরভাবে জোরালো প্রমাণ উপস্থাপন করছে, এ বিষয়ে তোমরা সন্দিহান হয়ো না।'

ঘোষণা

'ইযালায়ে আওহাম' (সন্দেহ সংশয় নিরসন) পুস্তকটিতে ঐ যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর রয়েছে যা সাধারণভাবে মানুষ অজ্ঞতা বশত হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন ও মৃত্যুর বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপন করে থাকে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, যে ব্যক্তি এ পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পুরো মনোনিবেশে পাঠ করবে তার মনে এ সম্পর্কিত কোন সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট থাকবে না।

অতএব খোদা তা'লা যদি তাঁকে এ পুস্তকের মাধ্যমে সত্য অনুধাবনে পথপ্রদর্শন করেন এবং তার হৃদয়-দ্বার খুলে দেন তার অবশ্যকর্তব্য হবে, তিনি যেন তাঁর নতুন জানা এই বিষয়াদি দ্বারা অন্যদেরও উপকৃত ও লাভবান করেন। আর যিনি এ গ্রন্থের উপস্থাপিত দিকনির্দেশনা পুরো আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করতে সমর্থ হন তাঁর জন্য এও আবশ্যক, তিনি যেন সাধারণভাবে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হন। এ গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পর বিরোধীদের পক্ষে সমীচীন ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে এটাই বাঞ্ছনীয় যে, তারা যেন মৌখিক তর্ক-বিতর্ক বন্ধ রেখে এ গ্রন্থের বিষয়াবলী গভীর মনোনিবেশে অধ্যয়ন করেন। তারপরও তারা যদি এর দিকনির্দেশনা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম না হন তাহলে তারা যেন এতে উপস্থাপিত দলিল ও যুক্তি-প্রমাণ খন্ডন করে দেখান।

আমার শেষ উপদেশ তাদের সপক্ষে এটাই যে, আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু'কে ভয় করুন। **'ওয়া লা-মাক্বতুল্লাহি আক্‌বারু মিন্ মাক্বতিহিম। ওয়াস্‌সালামু আলা মানিতাবায়িল হুদা।'** (অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি তাদের ঘৃণার চেয়ে অনেক বড় তথা ভয়ঙ্কর। আর যারা হিদায়াত গ্রহণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক –অনুবাদক)।

ঘোষণাকারী:

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

(মহল্লা ইকবালগঞ্জ, লুধিয়ানা থেকে)।

১৩নং প্রশ্ন: ইলহাম (ঐশীবাণী)–যার ভিত্তিতে 'ইজমা' তথা সর্বসম্মত ঐকমত্যের গন্ডীবহির্ভূত হওয়ার পথ অবলম্বন করা হয়েছে– স্বয়ং এই ইল্‌হাম একটি ভিত্তিহীন, অবান্তর ও অহেতুক বস্তু বৈ কিছুই নয়। এর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি।

উত্তর: জানা আবশ্যক, আমি সবিস্তারে লিখে এসেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সাথে এই 'ইজমা'– ঐকমত্যের কোনো সম্বন্ধ ও সংশ্রব নেই। 'ইজমা' সেই সব বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে যেগুলোর হকীকত ও স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে পুরোপুরি অনুধাবন ও প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করা হয়েছে এবং শরীয়তবাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজে সেগুলোর খুটিনাটি সব বিষয় বুঝিয়ে, দেখিয়ে ও শিখিয়ে গেছেন, যেমন– নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও তৌহীদ সম্পর্কিত আকিদা-বিশ্বাস এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি। কিন্তু এই সব জাগতিক ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক বিষয় এখনও লুক্কায়িত, প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট অবস্থায় রয়েছে। শরীয়তবাহক নবী করীম (সা.) যদি এগুলোর কিছু ব্যাখ্যা বর্ণনা করেও থাকেন তাহলে তা এমন, যা রূপকতার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করায়। উদাহরণস্বরূপ, হযরত মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে বন-জঙ্গলে শুকর নিধন করার শিকার খেলে বেড়াবেন, দাজ্জাল কা'বাগৃহের তওয়াফ করবে এবং মসীহ্-ইবনে মরিয়ম অসুস্থের মতো দু'জন ফিরিশ্‌তার কাঁধে হাত রেখে কা'বা-গৃহের তওয়াফ করার ফরয কর্তব্যটি পালন করবেন– এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহের ওপর কি 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণিত হতে পারে? এসব হাদীসের যে-সকল ব্যাখ্যাকারী গত হয়েছেন তাঁরা যে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে দিগ্বিদিক নিজ নিজ ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের তীর নিক্ষেপ করেছেন তা কারও কি অজানা? কোনো (ভবিষ্যদ্বাণীমূলক) বিষয় যদি 'ইজমা' হিসেবে মীমাংসিত হয়ে থাকতো, তাহলে উল্লিখিত ব্যাখ্যাদানকারীগণ কেনই-বা বিভিন্ন রকম ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতেন? কুফরির ভয় কি তাঁদের ছিল না?

আর রইলো এ বিষয়টি যে, ইলহাম (ঐশীবাণী) কিনা ভিত্তিহীন! অহেতুক ও অবান্তর এমন এক বস্তু যার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি– এ বক্তব্য সংবলিত প্রশ্নটির সম্পর্কে জানা আবশ্যক যে, এ ধরণের কথা কেবল এরকম লোকেরই হতে পারে যে কখনও 'শারাবান তহুরা' হিসেবে স্বর্গীয় পানীয় বিশেষ এই 'ইল্‌হাম' বা ঐশীবাণীর স্বাদ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে নি এবং যে ব্যক্তি এ আকাঙ্খাও পোষণ করে না, সে যেন প্রকৃত ও যথার্থ ঈমানের অধিকারী হতে পারে। বরং সে গতানুগতিক প্রথা ও বদ্ধমূল অভ্যাস ও প্রচলিত রীতি অনুসরণেই সন্তুষ্ট। আর কখনও সে এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না যে, মহান আল্লাহ্-পাকের প্রতি কতটুকু তার দৃঢ়বিশ্বাস এবং প্রয়োজনীয় কী পরিমাণ তার মা'রিফত তথা ঐশীতত্ত্বজ্ঞান রয়েছে। আরো কী তার করণীয় কর্তব্য, যাতে তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সমূহ দূরীভূত হয় এবং তার আমল-আখলাক ও ইচ্ছা-এরাদায় এক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত পরিবর্তন উদ্ভাসিত হয় এবং তার মাঝে সেই ঐশী প্রেম ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়, যার দরুন সে সহজ-সঠিকভাবে আখেরাতের সফর অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং তার মাঝে সদা উন্নতি করার এক অতি উত্তম গুণ ও যোগ্যতার উন্মেষ ঘটে।

নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি সবার পক্ষে বোধগম্য ও অনুধাবন যোগ্য যে, মানুষ তার এই গাফিলতিপূর্ণ জীবন যা তাকে সারাক্ষণ পাতালের (অধঃপতনের) দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাছাড়া স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে তার সম্পর্কাবলী প্রতিমুহূর্ত তাকে ভারি পাথরবৎ নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে তথা মানুষ আবশ্যকীয়ভাবে এক ঊর্ধ্বলোকীয় শক্তির মখাপেক্ষী। যা তাকে সত্যিকার স্বচ্ছদৃষ্টি এবং সত্যিকার 'কাশফ্' তথা দিব্যশক্তি দান করে খোদা তা'লার পরম বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য দর্শনের অভিলাষী করে তোলে। অতএব জানা আবশ্যক যে, এ ঊর্ধ্বলোকীয় শক্তিটি হলো 'ইলহাম' (ঐশীবাণী), যা চরম দুঃখের সময়ও পরম আনন্দ যোগায় এবং পর্বতসম বিপদাবলীর চাপের নীচেও অতীব সুখানুভূতি ও স্বস্তির সাথে দাঁড় করিয়ে দেয় ও তাকে দন্ডায়মান রাখে। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমসত্তা যিনি নিছক যুক্তিবাদীদের চোখকে ধাঁধিয়ে দেন। তাদের দৃষ্টির সমানে যিনি অন্ধকারস্বরূপ প্রতীয়মান এবং সকল বুদ্ধিদীপ্ত প্রজ্ঞাবানদের (জ্ঞান-বুদ্ধিকে) হতবাক করে রেখেছেন তিনি ইলহামের মাধ্যমেই নিজের অস্তিত্বের যৎকিঞ্চিৎ সন্ধান দিয়ে থাকেন এবং 'আনাল্ মওজুদ' ('আমি অবশ্যই বিদ্যমান') বলে তাঁর অন্বেষায় পথচারীদের হৃদয়কে আশ্বস্ত ও প্রশান্তি-সুধায় সিক্ত করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের শীতল বায়ু দিয়ে বিষন্ন ও বিমর্ষ প্রাণকে সজীবতা দান করেন। এ কথা তো সত্য যে কুরআন করীম হেদায়াত বা দিকনির্দেশনার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু কুরআন করীম যাকে হেদায়াতের উৎসমূলে উপনীত করে থাকে তার মাঝে প্রথম সনাক্তমূলক চিহ্ন এটাই প্রষ্ফূট হয় যে, তার সাথে পবিত্র ঐশী-বাক্যালাপ শুরু হয়ে যায়। এর দরুন অতি উন্নত ধারায় উন্মোচিত 'মারেফত' (সূক্ষ্ম-তত্ত্বজ্ঞান) ও চাক্ষুষ বরকত ও কল্যাণ এবং জ্যোতির্ময়তার উদ্ভব হয়। আর সেই ইরফান বা ঐশীজ্ঞান উদ্ঘাটিত হতে শুরু করে, যা কেবল গতানুগতিক অনুকরণ প্রসূত অনুমান নির্ভর ধ্যান-ধারণা বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবঞ্চনামূলক চাতুর্যের মাধ্যমে কখনও লাভ করা যায় না। কেননা নিছক অনুকরণমূলক গতানুগতিক বিদ্যাবুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত। কেবল যুক্তিগত ধ্যান-ধারণা ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই আমাদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের ঐশীজ্ঞান বাড়ানো ও ব্যাপকতর করা অত্যাবশ্যক। কেননা যে-পরিমাণ আমাদের ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞান হবে সে-পরিমাণই উদ্যম-উদ্দীপনা আমাদের মাঝে সৃষ্টি ও সক্রিয় হবে। ত্রুটিযুক্ত জ্ঞানতত্ত্ব সত্ত্বেও কি আমাদের কোনো উদ্যম-উদ্দীপনা লাভের আশা আছে? না, একেবারেই নেই। অতএব অদ্ভূত ব্যাপার যে, ওই সব লোক কতো অলীক চিন্তাচেতনায় নিপতিত যারা সত্যখোদা ও প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার এ রকম মাধ্যমের দিকে নিজেদের অমুখাপেক্ষী বলে মনে করে যে-মাধ্যমটির সাথে আধ্যাত্মিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত?!

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশী ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বোপলব্ধি কেবল ইলহাম (ঐশীবাণী) ও কাশ্ফ (দিব্যদর্শন)-এর মাধ্যমেই লাভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পর্যায়ের জ্যোতির অধিকারী না হই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মানবত্ব যথার্থ কোনো 'মারেফত' (ঐশীজ্ঞানতত্ত্ব) ও পরিণত সিদ্ধিলাভে অভিসিক্ত হতে পারবে না। কেবল কাক বা ভেড়ার মতো মল ও বিষ্টাকে মিষ্টান্ন বলে মনে করতে থাকবে। আর তাই আমাদের মাঝে স্বচ্ছ ঈমানী অন্তর্দৃষ্টিরও উন্মেষ ঘটবে না। কেবল শৃগালসুলভ মার-প্যাঁচ অনেক স্মরণ থাকবে, অথচ অত্যন্ত মহৎ এক উদ্দেশ্যে তথা সুনিশ্চিৎ সত্য 'মারেফৎ' ও প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধির জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সে-মারেফতই আমাদের নাজাত ও পরিত্রাণের মাপকাঠিও বটে– যা প্রত্যেক কলুষ ও খাদযুক্ত অশুভ পন্থা থেকে আমাদের অব্যাহতি দেয় এবং পবিত্র ও স্বচ্ছ এক স্রোতধারার সাথে আমাদের মুখ স্থাপন করিয়ে দেয়। আর এমনটি আমরা কেবল ইল্হাম-ইলাহী বা ঐশীবাণীর মাধ্যমেই লাভ করে থাকি। বস্তুত আমরা যখন আমাদের 'নফ্স' তথা প্রবৃত্তির মন্দ বাসনা-কামনা থেকে সম্পূর্ণ 'ফানা' তথা পরিত্রাণ লাভ করি এবং অতি এক বেদনাসিক্ত হৃদয়ে ও (ঐশী আনুগত্যে) আত্মবিলীন হয়ে গভীর এক 'ডুব' দেই, তখন আমাদের 'বাশারিয়্যত' (মানবীয় সত্তা) মহান আল্লাহ্‌র দরবারে পতিত হয়ে সেখান থেকে ফেরার সময় সেখানকার শনাক্তমূলক কিছু স্বর্গীয় নিদর্শন ও জ্যোতি সঙ্গে বয়ে নিয়ে ফিরে আসি। অতএব যে-জিনিসকে এ পার্থিব জগতের মানুষ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, সেটিই প্রকৃতপক্ষে এমন এক বস্তু, যা সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী ঐশী বিরহগ্রস্ত ব্যক্তির এক মুহূর্তেই তার মহান প্রেমাস্পদের সাথে মিলন ঘটিয়ে দেয়। এতে করে আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন রকম প্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সহসা তা থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নেন। এই প্রকৃত জ্যোতি (তথা ইল্হাম) মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো হৃদয় আলোকমন্ডিত হতে পারে না।

মোটকথা, মানবীয় বুদ্ধিমত্তার ত্রুটি ও অক্ষমতা এবং প্রথাগত পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যার সীমাবদ্ধতা ইল্হামের আবশ্যকীয়তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দুনিয়াজুড়ে যত বুদ্ধিমান রয়েছেন অথবা এমন সাধক (তথা সূফী-পীর-দরবেশ) যাদের হৃদয় প্রকৃতপক্ষে এই পবিত্র (ইলহামবৎ) স্রোতধারা থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন, তাদের (নিরস) আচার-আচরণ, চাল-চলন ও তাদের নৈতিক সংকট ও সঙ্কোচন এবং তাদের হীন চিন্তা-চেতনা আর তাদের লজ্জাস্কর সব কার্যক্রম আমার এই বর্ণনার

যথার্থতার স্বাক্ষর বহন করে যে, তারা এই পবিত্র স্বর্গীয় প্রস্রবণ (ঐশীবাণী) ব্যতিরেকে কত দূষিত অবস্থায় পতিত। কুয়ার এক ফোটা নোংরা পানিতেই এর সার্বিক দূষণ প্রতীয়মান হয়।

যদিও এ শ্রেণীর লোকদের দার্শনিক-সুলভ কথা জনমনে এক রকম আলোড়ন সৃষ্টি করে কিন্তু এর মাঝে প্রকৃত জ্যোতির অনুপস্থিতির দরুন খুব শীঘ্রই এর মধ্যকার আঁধার দৃশ্যত দেখিয়ে দেয়। তাদের সর্বজ্ঞসুলভ আত্মম্ভরিতা ও হাক-ডাক সত্ত্বেও এই লোকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্বীয় নিঃস্বতা প্রকাশ করতে থাকে এবং প্রায়শঃ আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভে ব্যর্থতার দরুন এ শ্রেণীর দার্শনিক, বিদ্বান এবং মৌলবী ও আলেম-উলামা কর্তৃক এরকম কর্ম-কান্ড সংঘটিত হতে থাকে যা এ মর্মে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য তুলে ধরে যে, তারা স্বস্তি ও প্রশান্তিদায়ক প্রস্রবণ হতে কতো সুদূরপরাহত এবং প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি লাভ না করার দরুন এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব এবং অন্য কথায়, তারা দিবা-নিশি এক কষ্ট, জ্বলন ও অস্থিরতায় ভুগছে। এ স্থলে কারও কারও স্বভাবত এ আপত্তির উদ্রেক হয় যে, সচরাচর এমন লোকও আছে যারা ইলহামের দাবী করে থাকে বরং ইলহামী বাক্যাবলী শুনিয়েও থাকে। কিন্তু তাদের মাঝে 'মা'রিফাত' তথা সূক্ষ্মতত্ত্বোপলব্ধির ক্ষেত্রে ইপ্সিত উপযুক্ততা পরিলক্ষিত হয় না এবং তাদের তত্ত্বজ্ঞান মূলক অবস্থার মান সাধারণ শ্রেণীর মানুষের চেয়ে উন্নত বলে প্রতীয়মান নয়। বরং তাদের মাঝে স্বভাবজাত তমসাচ্ছন্নতা ও হীনমন্যতা দৃশ্যমান। তাদের নৈতিক ও মেধাগত এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নিচয়ের দিক দিয়ে কোনোটিও সাধারণ স্তরের ঊর্ধে নয়। তথাপি, কী করে এমন লোকদের আমরা ইলহাম-প্রাপ্ত মনে করতে পারি এবং সকল কল্যাণের সেই মহান আল্লাহ্‌র বাক্যালাপের পাত্র বলে মেনে নিতে পারি, যাঁর নৈকট্য ও বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভের দরুন অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হওয়া অত্যাবশ্যক? ন্যুনকল্পে কতক বিষয়ে সেই পরিমাণ শুভ পরিবর্তন তাদের মাঝে থাকা আবশ্যক যা অন্যদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতএব জানা আবশ্যক, প্রকৃতপক্ষে এরকম লোক সত্যিকার অর্থে ইলহামপ্রাপ্ত নয়। বরং তারা এক প্রকার পরীক্ষা-কবলিত হয়ে থাকে। আর একে তারা নিজ অজ্ঞতাবশতঃ ইল্‌হাম (ঐশীবাণী) বলে মনে করে বসে। প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার ইলহাম ও ঐশী বাক্যালাপ সামান্য কোনো বিষয় নয়। যেমন, আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, অন্ধকারে বসা কোনো ব্যক্তির জন্যে যখন সহসা সূর্যের দিকে জানালা খুলে দেয়া হয় তখন তার অবস্থা একেবারে কীরূপ বদলে যায় এবং কীরূপে আকাশের আলো তার ইন্দ্রিয়সমূহে কার্যকর হয়! তখন তার জন্যে কীরূপ পরিবর্তিত এক নবজীবন সৃষ্টি করে দেয় আর স্বভাবতঃ বিষন্নতার কারণে সৃষ্ট যে অন্ধকার তা থেকে সে বেরিয়ে আসে এবং এক প্রফুল্লতা ও উদ্দীপনা তার হৃদয়ে, এক জ্যোতি তার চোখে এবং অসাধারণ এক 'ইস্তেকামাত' (অবিচল দৃঢ়তা) তার অবস্থা ও জীবনাচরণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব আকাশের দিক থেকে উন্মোচিত (ইল্‌হামবৎ) জানালারও সে একই অবস্থা। তবে সত্যিকার অর্থে এটি খুব কম সংখ্যক লোকই লাভ করে থাকেন। তোমরা তাঁদের অসাধারণ ও অলৌকিক লক্ষণাবলীর মাধ্যমে তাঁদেরকে সনাক্ত করতে পারবে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

বিজ্ঞপ্তি

তালীম দপ্তর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে **২০১৭ সালে** সর্বশেষ পরীক্ষায় **অংশগ্রহণ করে** ভাল ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের আগামী ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯৪তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জনকারী ৮ম শ্রেণী এবং তদূর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। এ জন্য ইতিমধ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের যে সকল শিক্ষার্থীরা সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য, স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী **১৫** জানুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে সে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য **১৫** জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। তাই এ বিষয়ে আপনাদের সকলকে বিশেষ যত্নবান হওয়ার অনুরোধ করছি। আরও উল্লেখ থাকে যে, কোন শিক্ষার্থী যদি আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম না পান, সেক্ষেত্রে সাদা কাগজে মুল শিক্ষাসনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর আবেদন পাঠাতে পারবেন।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম

ঐশী সাহায্যের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ

(২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ
ইমাম, মসজিদ ফজল, লন্ডন

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

(সূরা আল্ মু'মিন: ৫২)

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! আমার বক্তব্যের বিষয় হল, ঐশী সাহায্যের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ।

যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তা এই বিষয়ের দিক থেকে মৌলিক আয়াত। এর অনুবাদ হল, নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ইহকালেও সাহায্য করব আর সেদিনও যখন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতে বর্ণিত বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"আমাদের বিধান বা রীতি এটিই যে, আমরা আমাদের নবীদের এবং বিশ্বাসীদের ইহ ও পরকালে সাহায্য প্রদান করি"। (তফসীর মসীহ্ মওউদ, ৩য়খন্ড, পৃ: ১৯৯)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ একটি অমোঘ ও অকাট্য প্রতিশ্রুতি... আসল কথা হল, সত্যিকার সাহায্য ও সহায়তাকারী হলেন সেই পবিত্র সত্তা যার মহিমা হল, نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (তফসীর মসীহ্ মওউদ, ৩য়খন্ড, পৃ: ১৯৯)

সূধীবৃন্দ! বিশ্ব-স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক এর সকল পবিত্র বৈশিষ্ট্যের ন্যায় ঐশী সাহায্যের বিষয়টিও অত্যন্ত ও ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত আর বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রান্তখোদার এই নিয়ামতের চাক্ষুস সাক্ষী। পবিত্র কুরআনের অগণিত আয়াতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (সূরা আর্ রহমান: ৩০) অনুযায়ী ঐশী সাহায্যের বিকাশ ঘটতে থাকে। অদৃশ্য হতে সুরক্ষা ব্যবস্থা কখনো সরাসরি এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে আবার কখনো বিরুদ্ধবাদীদের লাঞ্ছনা এবং অপদস্ত আর ব্যর্থ করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক নযমে বলেছেন,

খোদার পবিত্র বান্দারা খোদার কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেন
যখন তা আসে তখন বিশ্বকে আরেক নতুন জগত দেখিয়ে দেয়

তিনি বায়ুহয়ে পথের সব খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে যান
তিনিঅগ্নি হয়ে প্রত্যেক শত্রুকে দগ্ধ করেন।
কখনো তিনি মাটি রূপে শত্রুদের মাথায় নিপতিত হন
কখনো তিনি পানি হয়ে তাদের ওপর এক তুফানরূপে আঘাত আনেন।
বস্তুত খোদার কাজ বান্দার অপলাপে কখনো বন্ধ হতে পারে না
স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির শক্তিই বা কতটুকু?

বিভিন্ন নবীর যুগে ঐশী সাহায্য

সম্মানিত সূধী! নবীদের জীবনে ঐশী সাহায্যের বিকাশ বিভিন্ন আঙ্গিকে ঘটেছে।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(সূরা আল্ মুজাদিলা: ২২) অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদীদের সর্বাত্মক বা মরণপন চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা সত্ত্বেও নবীরা তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সফল ও কামিয়াব হয়েছেন আর বিরোধীরা সর্বদা ব্যর্থতা ও অসফলতার মুখ দেখেছে। হযরত নূহ্, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত ইউনুস, হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং অন্যান্য নবীর উপমা পবিত্র কুরআনে বার বার ঘুরে-ফিরেবর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সদা সব নবী এবং তাঁদের অনুসারীদের শীরে ছায়ারূপে বিরাজমান ছিল।

আমাদের অভিভাবক ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আশিসপূর্ণ যুগ যখন আসে তখন সমস্যার ভয়ানক পাহাড়ের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের বিষয়টি এক অসাধারণ মহিমায় বিকশিত হয়। পবিত্র জীবনের এক একটি মুহূর্ত 'নূরুন আলা নূর'এর দৃশ্য উপস্থাপন করতে থাকে। নবুয়্যতের ঘোষণা করার পর মক্কায় অত্যাচার-নিপিড়নের দুর্বিষহ যুগ আরম্ভ হয়। মক্কা থেকে হিজরতের সংকটাপন্নযুগ আসে। সওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণের সময় চরম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওহোদ এবং অন্যান্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে, ইহুদী রমনীর বিষ খাওয়ানোর গভীর ষড়যন্ত্রের সময়, মোটকথা সকল পরিস্থিতিতে মহাপরাক্রমশালী খোদার সাহায্য ও সমর্থনের ছায়া তাঁর শীরে বিরাজমান ছিল আর 'ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান্ নাস' {আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন (সূরা আল্ মায়েদা :৬৮)}-এর সুসংবাদ তাঁর সাথে ছিল আর তিনি (সা.) 'ইয়াদখুলুনা ফি দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা'{দলে দলে মানুষ আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করবে (সূরা নাসর:৩)}-এর দৃশ্য দেখে এই সুমহান ও সার্থক ব্যক্তিত্ব এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন।

পবিত্র মসীহ্‌র আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অমানিশায় নিমজ্জিত এই অন্ধকার যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর

আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ এবং খোদার অস্তিত্ব প্রদর্শন। তিনি তাঁর মনিব ও অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আশিসের কল্যাণে বিশ্ববাসীর চিরস্থায়ী নাজাত বা মুক্তি আর আধ্যাত্মিক নবজীবনের শুভসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, "আমি সমগ্র বিশ্বজগতকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, "ইসলামের খোদা হলেন একমাত্র জীবন্ত খোদা" (মজমুয়া ইশতিহারাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৩১১)

তিনি (আ.) বলেন, "আমি আবির্ভূত হয়েছি যাতে আমার মাধ্যমে খোদা প্রকাশিত হন"। (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খন্ড, পৃ: ৬১৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন,"তিনি আমাকে প্রেরণ করে সকল নাস্তিক এবং অবিশ্বাসীদের মুখ বন্ধ করার সংকল্প করেন যারা বলে যে, খোদা নেই।" (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খন্ড, পৃ: ৬২০)

এই সুমহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে মহা পরাক্রমশালী খোদা এই নিষ্ঠাবান দাসকে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়ার কল্যাণে অসাধারণ সাহায্য ও সমর্থন আর প্রতি পদে পদে ঐশী সাহায্যের সম্পদে ভূষিত করেছে। তিনি কত চমৎকারভাবে বলেছেন, "আমি তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের এক জীবন্ত নিদর্শন"। (লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃ: ২৫১)

যুগের মামুর এবং যুগ মসীহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গোটা জীবনই ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের এক অতল সমুদ্র ছিল। তিনি তাঁর জীবনের কত সুন্দর চিত্র বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখা পঙ্কতি রয়েছে–

"সূচনা হতে তোমার ছায়াতেই আমার দিন কেটেছে,
তোমার কোলে আমি ছিলাম দুগ্ধপায়ী শিশুর মত"

প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্ তা'লারসাহায্য ও সমর্থনের ছায়া ছিল তাঁর শীরে।

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

{নিশ্চয় তারা সাহায্য-প্রাপ্ত হবে (সূরা আস্ সাফ্ফাত: ১৭৩)-এর ঐশী প্রতিশ্রুতি বার বার পূর্ণ হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহায্যকারী, সমর্থনকারী এবং সুরক্ষাকারী ছিলেন। আর সকল শত্রু সম্মিলিতভাবেও তাঁর পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি (আ.) স্বয়ং বলেছেন, "খোদা তা'লার কৃপা ছিল, তারা আমাকে ধ্বংস করার জন্য সব ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু কিছুই করতে পারে নি... খোদা তা'লা তাদের আক্রমন থেকে আমার সম্মান রক্ষা করেছেন... যার দৃষ্টিশক্তি আছে সে দেখুক! এটি কি খোদার কাজ না কোন মানুষের?" (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খন্ড, পৃ: ৪৬১-৪৬৪)

কল্যাণ লাভের বাসনায় ঐশী সাহায্য আর খোদার সাহায্য ও সমর্থনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করছি।

পুলিশ হাতকড়া নিয়ে দ্বারে উপস্থিত হলেও কিছুই হবে না।

১৮৯৯ সনের কথা, একবার পুলিশ হঠাৎ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়ী তল্লাশীর জন্য আসে, পূর্বে এই সংবাদ কেউ জানত না আর জানা সম্ভবও ছিল না। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব কোনভাবে শুনতে পান যে, পুলিশ হাতকড়া এবং গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে এসে গেছে। মীর সাহেব রূদ্ধশ্বাসে... হযরত সাহেবকে এই সংবাদ দিতে দৌড়ে যান আর কিন্তু হাপাতে থাকার কারণে অনেক কষ্টে তিনি তাঁকে কষ্টদায়ক সংবাদটি দেন। হযরত সাহেব তখন নূরুল কুরআন পুস্তক প্রণয়ন করছিলেন আর অত্যন্ত সুক্ষ্ম এবং জটিল বিষয়ের সম্মুখীন ছিলেন।মুখ তুলে হেসে বলেন,

"মীর সাহেব! মানুষ পার্থিব জগতের লোভে সোনা-রূপার কঙ্কণ পরিধান করে, আমরা মনে করব, আমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে লোহার কঙ্কণ পরেছি। এর কিছুক্ষণ পর আবার বলেন, "কিন্তু এমনটি হবে না, কেননা খোদা তা'লা ... তাঁর মনোনীতদের এরূপ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়া পছন্দ করেন না। (মলফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬, লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

ঐশী সাহায্য এরূপ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে যে, পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেই ফিরে যায়।

সুরক্ষার আদলে ঐশী সাহায্যের বিকাশ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এক রাতে একটি বাড়ীর দোতালায় শুয়ে ছিলাম এবং সে কক্ষে আমার সঙ্গে আরও পনের-ষোল জন মানুষ ছিল। রাতের বেলা ঘরের বীম বা কড়িকাঠে টিকটিক করে শব্দ হয়। আমি লোকদের ঘুম থেকে উঠিয়ে বলি, ঘরের আড়া বা কড়িকাঠের অবস্থা আশংকাজনক মনে হচ্ছে তাই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিৎ। তার বলল, হয়তো কোন ইদুর হবে, ভয়ের কোন কারণ নেই এ কথা বলে তারা আবার শুয়ে পরে, কিছুক্ষণ পর আবার একই ধরণের শব্দ হয়। তখন আমি তাদের আবারও জাগাই তবুও তারা কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করেনি। এর পর তৃতীয় বার আড়া বা কড়িকাঠ থেকে শব্দ আসলে তখন আমি তাদেরকে জোর করে উঠাই আর সবাইকে ঘর থেকে বাইরে বের করি এবং সবাই যখন বেরিয়ে যায় তখন আমিও সেখান থেকে বের হই। আমি তখনও সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে ছিলাম এমন সময় হুড়মুড় করে ছাদ ধ্বসে পড়েআর সবাই প্রাণে বেঁচে যায়। (হায়াতে তাইয়্যেবা, পৃ: ১৯)

প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের আরও একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা স্মরণ করার যোগ্য।

একবার কোন বাহাস বা ধর্মীয় বিতর্কের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন বিরোধী একটি উদ্ধৃতি চেয়ে বসে। অথচ সে সময় সেই উদ্ধৃতি তাঁর স্মরণে ছিল না এবং তাঁর সেবকদের মধ্যেও কারো তা স্মরণ ছিল না। যাহোক, বিশৃঙ্খলার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু হযরত সাহেব বুখারী শরীফের একটি খন্ড আনান এবং আপন মনে পৃষ্ঠা উল্টাতে আরম্ভ করেন এবং দ্রুততার সাথে একেকটি পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন আর অবশেষে এক জায়গায় তিনি থেমে যান আর বলেন, নাও এটি লিখে নাও। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে দেখছিল যে, ঘটনা টা-কি? এমনকি কোন একজন হযরত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন আর উত্তরে হযরত সাহেব বলেন, যখন আমি পুস্তকটি হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে আরম্ভ

করি তখন আমার কাছে পুস্তকের পৃষ্ঠগুলো মনে হচ্ছিল খালি এবং তাতে কিছুই লেখা নেই। তাই আমি সেগুলো দ্রুততারসাথে উল্টাতে থাকি। অবশেষে আমি এমন একটি পৃষ্ঠা দেখতে পাই যাতে কিছু লেখা ছিল। তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এটিই সেই উদ্ধৃতি যা আমার প্রয়োজন। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন, সেই জায়গা যেখানে উদ্ধৃতিটি ছিল তা ছাড়া বাকি সব জায়গা খালি দেখা যাচ্ছিল। (সীরাতুল মাহদী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ২-৩, ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত)

আল্লাহ্‌র মহিমায় মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে

নিজ প্রিয়দের সাথে মহাশক্তিশালী খোদা তা'লার ভালোবাসার ব্যবহার বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে। তিনি তাদের হৃদয়ের গহীনে থাকা প্রচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষাও নিজ মহিমা বা কুদরতে পূর্ণ করে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কাদিয়ান থেকে গুরুদাসপুর যাবার পথে বাটালায় অবস্থান করেন। সেখানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি উপহারস্বরূপ তাঁকে কিছু ফল প্রদান করে। এরমধ্যে আঙ্গুরও ছিল। তিনি সেই আঙ্গুর খান আর বলেন, "এখনই আমার মন আঙ্গুর খেতে চাইছিল, অতএব খোদা তা'লা তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" (সীরাতুল মাহদী, প্রথম খন্ড, পৃ: ২৮, ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত)

বিপদসঙ্কুল বা প্রতিকূল পরিবেশেও ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের অগণিত ঘটনার বরাতে হযরত মসীহে পাক (আ.) কতইনা সুন্দরবলেছেন, "আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, খোদা আছেন"। (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৬, ১৯৮৪ সনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

ঐশী সাহায্যের ব্যাপকতা এবং আশিসময় সুসংবাদ

ঐশী সাহায্য বিকাশের প্রাচুর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্আউয়াল (রা.) বলেন, 'কত আনন্দ ও আশার কথা যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এই জগতেও লাভ হয় আর ইহজগতে সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া মূলত পরকালের সাহায্য লাভের বিষয়ের একটি অকাট্য দলিল। উপরন্তু, প্রত্যেক মু'মিন এবং নিষ্ঠাবান খোদার সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে। যদি শুধুমাত্র আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য এটি প্রযোজ্য হত তাহলে সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্য এ বিষয়টি কতটা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত। কিন্তু এটি খোদার কত মহান অনুগ্রহ যে, তিনি বলেছেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

(সূরা আল্ মু'মিন: ৫২) অর্থাৎ, আমরা আমাদের রসূল ও মু'মিনদের এ জগতেই সাহায্য করি) ... এই সাহায্য আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়করভাবে প্রকাশ পায়। কেননা, এরূপ সাহায্যের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাপুরুষের সত্যতার প্রমাণ এবং আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সত্যায়নের একটি অকাট্য দলিল প্রকাশিত হয়। আর এক মহান ও ক্ষুরধার যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যা খোদার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।'(হাকায়েকুল ফুরকান, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫২৪-৫২৫)

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক বিভিন্ন ঘটনার প্রতি

সম্মানিত সুধী! আসুন এবার বিভিন্ন ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখা যাক, ঐশী সাহায্য কীভাবে মু'মিন বা বিশ্বাসীদের জীবন চলার পথে আপন বিকাশ ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করে।

খোদার হিফাযতের বিস্ময়কর ঘটনা

জামাতের একজন নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ ডাক্তার মোহাম্মদ রমযান সাহেব তুর্কী বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা তার চিকিৎসায় আরোগ্য নিহিত রেখেছেন। (অর্থাৎ, তার চিকিৎসায় রোগীরা আরোগ্য লাভ করে) তার পুণ্যময় খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অনেক মানুষের একেবারেই পছন্দ ছিল না। আহমদীয়াতের ধোঁয়া তুলে কয়েকজন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটে।

একরাতে এই ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য লোকেরা অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার বাড়ীতে যায়। তার ভৃত্য তাদেরকে দেখতে পেয়ে দরজা বন্ধ করে রাখে। কিন্তু তিনি তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ভৃত্যকে বলেন, দরজা খুলে দাও আর তাদেরকে বৈঠকখানায় বসাও। ভৃত্য তাই করে। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেব ও প্রস্তুত হয়ে বৈঠকখানায় আসেন এবং আগত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা তো আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছ তাই না? তাহলে আমাকে দু'রাকাত নফল নামায পড়তে দাও, এর পর তোমাদের যা মন চায় করো। এরপর তিনি তাদের অনুমতি সাপেক্ষে নফল নামায পড়তে আরম্ভ করেন। তখনও তিনি সেজদারতই ছিলেন এমতাবস্থায় খোদাই ভালো জানে যে, তাদের কি হয়েছিল, অকস্মাৎ তারা সবাই উঠে চলে যায়। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্য হাত মরহুম ডাক্তার সাহেবকে আক্রমনকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন। (রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল্ ফযল, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)

"মৃত্যু আসলেও তা টলে যাবে" এর কীরূপ ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

খোদা তা'লার অসাধারণ সাহায্যের বিভিন্ন ঘটনা

ঐশী সুরক্ষার বিস্ময়কর বিভিন্ন ঘটনাআল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। এর আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

এ ঘটনাটি আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার একজন সাহাবী হযরত হাজী মোহাম্মদ আদ্ দ্বীন তাহালভী সাহেব (রা.)-এর। আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর তিনি যখন নিজ গ্রামে ফিরে যান তখন তাঁর এলাকার লোকেরা তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে যায় এবং তাকে হত্যার হুমকি দিতে থাকে। অবশেষে লোকেরা একদিন সত্য সত্যই তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাঁর দৌহিত্রী বর্ণনা করেন,

'একবার পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। তিনি তাদেরকে বলেন, যদি মারতেই এসে থাক তাহলে আমি দু'রাকাত নফল পড়ে দোয়া করতে চাই। অতএব, তিনি নিকটস্থ মসজিদে চলে যান। সেখানে এরূপ বিগলিত চিত্তে দোয়ারত হন যে, কত সময় পার হয়েছে তা তিনি বুঝতেই পারেন নি। বাইরে লোকেরা মনে করে, সম্ভবত তিনি ভয় পেয়েছেন। অনেকক্ষণ পর তিনি যখন

বাহিরে আসেন তখন তিনি একজন অশ্বারোহীকে আসতে দেখেন আর তিনি ধমকের সুরে বলেন, এ ব্যক্তির গায়ে কেউ হাত তুলবেনা। সেই ব্যক্তির কথায় এতটাই প্রভাব ছিল যে, সমবেত লোকেরা একথা শোনামাত্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর এভাবে আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।" (লন্ডন থেকে প্রকাশিত আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ এপ্রিল, ২০০১)

ঐশী সাহায্য এবং দোয়া কবুল হওয়ার মাঝে সম্পর্ক

ঐশী সাহায্য এবং দোয়া কবুল হওয়ার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুগ ইমাম সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা একস্থানে তাঁকে শনাক্ত করার চিহ্ন যা নির্ধারণ করেছেন তাহল, তোমাদের খোদা সেই খোদা! যিনি ব্যাকুল চিত্তের দোয়া শ্রবণ করেন যেমনটি তিনি বলেন,

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ

(সূরা আন্ নমল: ৬৩) এরপর খোদা তা'লা যখন দোয়া গ্রহণ করাকে স্বীয় অস্তিত্বের চিহ্ন বা পরিচয়আখ্যা দিয়েছেন তাহলে কীভাবে কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে, দোয়া করার পর কোন সুস্পষ্ট প্রভাব প্রকাশিত হয় না। ...মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, যেভাবে আকাশ ও পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যের প্রতি অভিনিবেশ করার পর সত্যিকার খোদাকে চেনা যায় অনুরূপভাবে দোয়া গৃহীত হওয়া দেখে খোদা তা'লার সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।" (তফসীর মসীহ্ মওউদ, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৮৫)

আরেক সময় তিনি (আ.) বলেন, "সত্য কথা হল, দোয়ার মাধ্যমে আমাদের খোদাকেচেনা যায়।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২০১, ১৯৮৪ সনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

ঐশী সাহায্য সম্পর্কে এক নাস্তিকের স্বীকারোক্তি

লন্ডনের শ্রদ্ধেয় শেখ মুহাম্মদ হাসান সাহেব মরহুম তার নিজের একটি ঈমান উদ্দীপক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, "ইয়াকুব নামের এক ব্যক্তি আমার সাথে কাজ করত, সে ছিল নাস্তিক মনমানসিকতার অধিকারী, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করত। তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। একদিন বিদ্রূপের স্বরে আমাকে বলে, দেখ! কত গরম পড়েছে, তুমি তোমার খোদাকে বল বৃষ্টি বর্ষণ করতে। আমি তাকে অনেক বুঝাই যে, আমরা দোয়া করতে পারি ঠিকই কিন্তু নির্দেশ দিতে পারি না। তিনি বলেন, আমি মনে মনে দোয়া করতে আরম্ভ করি, সেদিন রাতে আকাশে মেঘ জমে কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আজ দেখা হতেই সে আমাকে আবার খোঁচা দিবে। যা ভেবেছি তাই হয়েছে। যাওয়া মাত্রই সেই ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয় আর বার বার সে জোর দিতে থাকে যে, তোমার খোদা অনেক গর্জন করলেও বর্ষণ করেনি। সেখানে অবস্থান করাই সে আমার জন্য কঠিন করে তুলে। সময় ছিল বেলা ১১টা তাই উঠে বাইরে চলে যাই। প্রচন্ড গরম ছিল। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করি, হে খোদা! এই নাস্তিক তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আর আমাকেঅপমান-অপদস্তকরা হচ্ছে, তুমি এর মুখ বন্ধ করে দাও। আমার এই নিবেদনের তখনও খুব বেশি একটা সময় পার হয়নি, জানি না কোথা থেকে আকাশে মেঘ জমে আর আমার মুখের ওপর বৃষ্টির ফোটা পড়তে আরম্ভ করে। এরপর আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে মিনতি করি, সে এই হালকা বৃষ্টিকে কোন পাত্তাইদিবে না। ...এরপর কি হয়েছিল! মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রবল বায়ু বইতে থাকে। সেই নাস্তিক তখন বারান্দায় বসে ছিল আর প্রচন্ড বাতাস ও বৃষ্টির ছিটা তার মুখে গিয়ে লাগছিল। তখন সে অবলিলায় বলে উঠে, আজ আমি মেনে নিলাম যে, তোমাদের খোদা জীবন্ত খোদা। এর পাশাপাশি সে আরো বলে, এই খোদা কেবলমাত্র মির্যা সাহেবের অনুসারীদেরই খোদা হতে পারেন।"(রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল্ ফযল, ৩রা মে, ২০০৬)

একটি অতুলনীয় ঘটনা

ডেনমার্কের একজন প্রবীণ আহমদী মরহুম নূহ্ সোভেনড হ্যানসন সাহেবের একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই অধম জাপানে সেবারত ছিল তখন এক বন্ধু লন্ডন থেকে আমার কাছে আসে এবং কয়েকদিন অবস্থানের পর রাবওয়াহ্ চলে যান এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমার সাথে টোকিওতে তার আলোচনার কথা উল্লেখ করেন আর তা শুনে হুযূর (রাহে.) আমাকে লিখেন, উনার সাথে আপনার যে আলাপচারিতা হয়েছিল তা অতিদ্রুত লিখে পাঠান। এই চিঠি আমাকে কম্পিত করে তুলে কেননা, চিঠির বিষয়বস্তু এবং ধরণ এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল, কোন কথা হুযূরের কাছে খুবই অপছন্দ লেগেছে। মর্মযাতনার মধ্য দিয়ে রাত কেটেছে। সকাল হতেই আমি পুরো আলোচনা স্ববিস্তারে লিখে হুযূরকে পাঠিয়ে দেই। আর দিন গণনা করতে আরম্ভ করি যে, কবে হুযূরের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে। প্রতীক্ষার একেকটি প্রহর কাটানো আমার জন্য কঠিন হচ্ছিল। কয়েকদিন পর ডেনমার্ক থেকে হ্যানসন সাহেবের একটি পত্র আসে যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি টোকিওর গিনযা (Ginza) বাজারে যাচ্ছি। মাটিতে একটি কাগজ পড়ে থাকতে দেখে আমি তা উঠাই। এর পুরো বাক্যই ছিলবিদেশী ভাষায় লেখা।শুধুমাত্র একটি বাক্য ইংরেজিতে লেখা ছিল, Your case is all right (অর্থাৎ, তোমার বিষয়টি ঠিক আছে) বুঝতে পারছি না যে, এই স্বপ্নের অর্থ কি? এর সম্পর্ক যেহেতু জাপানের সাথে তাই আপনাকে লিখছি।

আমি এই চিঠি পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সিজদায় পতিত হই আর কয়েক দিনের মধ্যেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর পক্ষ থেকেও পত্র আসে যে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার বিষয় পুরোপুরি ঠিক আছে। দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। এই স্বপ্ন মূলতঃ আমার জীবনধারাই পাল্টে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ ভালোবাসার সাথে সাহায্য করেন আর স্বীয় অস্তিত্বের এক জীবন্ত প্রমাণ প্রদান করেন।

সামুদ্রিক সফরে হিফাযত বা সুরক্ষা

ঐশী সাহায্যের বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ {অর্থাৎ, প্রতিদিন তিনি নিত-নতুন মহিমায় প্রকাশিত হন (সূরা আর

রহমান: ৩০)}-এর বৈশিষ্ট্য রাখে আর জল ও স্থলে অহরহ এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হযরত মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব আফ্রিকা মহাদেশে মহান এবং ঐতিহাসিক সেবা প্রদান করেছেন। তিনি খুবই দোয়াগো এবং আল্লাহ্‌র ওলী ও ইসলাম সেবক ছিলেন। তার একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। একবার তার নাইজেরিয়া থেকে সিয়েরালিওন যাওয়ার কথা ছিল। তার স্ত্রী এবং এগারো বছরের সন্তান মোবারক আহমদও তার সাথে ছিল। সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণের সময় ডাক্তার সন্তানের অবস্থা দেখে সে স্পষ্ট বলে দেয় যে, এই বাচ্চা সফর করার মত অবস্থায় নেই। সাত দিনের সামুদ্রিক সফর আর আমাদের কাছে জাহাজে ঈড়ষফ ঝঃড়ৎধমববা হিমাগারের সুবিধেও নেই। সফরের সময় যদি এই সন্তান মারা যায় তাহলে সামুদ্রিক আইন অনুসারে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে। তাকে এই সফরে নিয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় হল, আপনি একটি ফরমে একথা লিখে দিন যে, যদি এই বাচ্চা সফরের সময় মারা যায় তাহলে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার অনুমতি আমাদের দিচ্ছেন।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! এখানে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন! সে সময় পিতামাতার মনের অবস্থা কীরূপ হবে। এক ছেলেকে কাদিয়ানে রেখে এসেছেন আর অপরজনের ক্ষেত্রে এমন দাবি জানানো হচ্ছে। হযরত মওলানা সাহেবের সহধর্মিণী অসহায়ের মত অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করেন আর হযরত মওলানা সাহেব আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাপরাক্রম ও শক্তিশালী খোদা! তার হৃদয়কে প্রশান্ত করেন বা আশ্বস্ত করেন এবং উচ্চস্বরে তিনি জাহাজের নাবিককে বলেন, বল কোথায় সাক্ষর করতে হবে আর তৎক্ষণাৎতিনি ফরমে সাক্ষর করে দেন। তিনি তার পুত্রের হাত ধরেন আর কান্নাজড়িত কণ্ঠে স্ত্রীকে বলেন, আমেনা! দৃঢ় বিশ্বাস রাখো! মুবারকের কিছুই হবে না। এই অবস্থায় তিনজনই জাহাজে আরোহণ করেন আর নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেন।আল্লাহ্ তা'লার মহিমা এবং তাঁর সাহায্য আর মওলানার গগণবিদারী দোয়ার কল্যাণ দেখুন, সেই মুবারক আহমদ শুধু ৭ দিনই জীবিত ছিলেন না বরং সেই ঘটনার ৭০ বছর পরও সুস্থএবং জীবিত আছেন আর আজও ধর্মসেবায় রত আছেন।

অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐশী সাহায্য

হযরত হাফেয হামিদ আলী সাহেব (রা.) অলৌকিকভাবে সাহায্য লাভ করা প্রসঙ্গে নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, 'একবার হযরত আকদাস (আ.) আমাকে একটি কাজে বিদেশ পাঠান। একটি নির্দিষ্ট জাহাজে আরোহণ করি। যখন জাহাজ অর্ধেক পথ অতিক্রম করে তখন সমুদ্রে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দেয় এবং এমন মনে হচ্ছিল যেন জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। লোকজন চিৎকার করছিল এবং জাহাজে কিয়ামত সদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হয়। লোকজন কাঁদছিল এবং আহাজারি করছিল। তখন আমি অত্যন্ত জোরের সাথে দাবি করে বলি, আমি পাঞ্জাব হতে এসেছি এবং এমন ব্যক্তির কাজে যাচ্ছি যাকে খোদা তা'লা এই যুগের জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এজন্য যতক্ষণ আমি এই জাহাজে অবস্থান করছি খোদা তা'লা এই জাহাজকে ডুবতে দিবেন না। অতএব, খোদা তা'লা সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন এবং জাহাজ ঝড়ের কবল হতে রক্ষা পেয়ে নিরাপদে তীরে এসে পৌঁছায়। আমি আমার গন্তব্যে নেমে পড়ি এবং জাহাজ পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদূর যাওয়া মাত্রই জাহাজ ডুবে যায়। হিন্দুস্তানে বা ভারতে যখন এই জাহাজ ডুবির সংবাদ পৌঁছে তখন আমার বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এর কাছে আসে এবং বলে, যে জাহাজে হামিদ আলী ছিল তা ডুবে গিয়েছে। হুযূর (আ.) বলেন,"হ্যাঁ, শুনেছি, যে জাহাজে হামিদ আলী ছিল তা অমুক তারিখ ডুবে গিয়েছে। একথা বলে হুযূর নিরব হয়ে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি বলেন, কিন্তু হামিদ আলী তো তার কাজ করছে। সে তো ডুবে নি।পরবর্তী ঘটনাক্রম হুযূর (আ.)-এর এ কথার সমর্থন করেছে। যতটুকু জানা যায় যে, হুযূর (আ.)-কে কাশ্‌ফী অবস্থায় পুরো ঘটনাটি দেখানো হয়েছে।" (তাযকিরা, পৃ: ৬৮৬, ২০০৪ সালে প্রকাশিত, ৪র্থ সংস্করণ)

হাফেয হামিদ আলী সাহেব (রা.)-এর এই অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসী ঐশী সাহায্য লাভের এক ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য অবলোকন করেছে।

আব্দুর রহীম সাহেবের ঈমানবর্ধক ঘটনা

ঐশী সাহায্য লাভের একটি ঘটনা মরিশাসের এক নিষ্ঠাবান আহমদী আব্দুর রহীম সাহেবের সাথে ঘটেছে, তিনি মরিশাস থেকে ইংল্যান্ডে আগমনকারী প্রথম আহমদী ছিলেন। বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং স্বীয় জীবন্ত ও মহাশক্তিশালী অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করেন।

ঘটনার বিবরণ হল, ১৯৪৩ সনে তিনি বোম্বেথেকেযুক্তরাজ্যে আসার উদ্দেশ্যে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে আরোহণ করেন। তখন যুদ্ধের সময় ছিল। যখনই জাহাজ যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় সাগরে প্রবেশ করে তখন জার্মানির একটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ হতে ঘোষণা শোনা যায়, সকল যাত্রী জাহাজ থেকে নেমে যান কেননা, দু'ঘন্টার মধ্যেই এই জাহাজকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। চতুর্দিকে হুড়োহুড়ি লেগে যায় এবং প্রত্যেকেই আপন জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠে। রহীম সাহেব সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দিকে এক নজর দেখেন এবং নিজের কেবিনে চলে যান আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সিজদাবনত হন। দোয়া করতে করতে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি অনুভব করেন যে, দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। এক জ্যোতির্ময় সত্তাকে নিজের সামনে দেখেন যিনি রহীম সাহেবকে এই সুসংবাদ দেন যে, তাঁকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হবে। রহীম সাহেবের হৃদয় খোদা তা'লার প্রশংসা এবং মহিমায় ভরে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নাবিককে এ কথা জানিয়ে দেন। নাবিক এবং তার সহকর্মিরা তার কথা শুনে হাসেন।

এরপর কী হয়েছে? এর ঈমানবর্ধক ঘটনাটির বিবরণ হল, কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক ঘন কুয়াশায় ছেঁয়ে যায় যার ফলে আশেপাশের কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। ফলে শত্রুপক্ষ কোন কিছু করারই সুযোগ পায় নি এবং রহীম সাহেবের সামুদ্রিক

জাহাজ নিরাপদে স্কটল্যান্ডের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করে। তাঁর হৃদয়ে এডেনবারাতে নেমে লন্ডন পর্যন্ত বাকী পথ ট্রেনে যাওয়ার খেয়াল জাগে। নাবিকের অনুমতি নিয়ে তিনি জাহাজ থেকে নেমে যান এবং সেই জাহাজ সাউথহ্যাম্পটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এডেনবারার সমুদ্রবন্দরে একজন অফিসার তাঁকে বলেন, যে জাহাজ থেকে সে নেমেছে তা এডেনবারা থেকে কিছুদূর যাওয়া মাত্রই জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তা যাত্রীসহ ডুবে যায়। আব্দুর রহীম সাহেব একথা শোনামাত্রই আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হন যে, কীভাবে সর্বশক্তিমান ও মহান খোদা এবং জল ও স্থলের মালিক খোদা মুহাম্মদী মসীহ্‌র এক নগণ্য দাসকে তাঁর নিজ হাত দ্বারা রক্ষা করেছেন। সেই জ্যোতির্ময় সত্তা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণতা লাভ করেছে। আর শুধুমাত্র তাঁকে প্রাণে রক্ষা করে খোদা তা'লা আপন সত্তা ও শক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদান করেছেন।

অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে আপন সত্তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেন
আর এটিই হচ্ছে এই অপরিচিতকে চেনার মাধ্যম।
(আব্দুর রহিমসাহেবের পুত্র মাহমুদ রহিমের লিখিত বর্ণনার সারাংশ,লন্ডন)

বিশ্বের প্রান্তে-প্রান্তে ঐশী সাহায্যের জ্যোতির্বিকাশ

ইসলাম এক বিশ্বজনীন খোদার পরিচয় উপস্থাপন করে থাকে যার দয়া ও সাহায্যের জ্যোতির্বিকাশ পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পৃথিবীর কোন অংশই তাঁর অনুগ্রহরাজি থেকে বঞ্চিত নয়। সময়ের সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'লার কল্যাণ গোচরীভূত হয় এবং তা ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

২০০৪ সনের কথা যখন সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.) ঘানা গমন করেনতখন সফরের এক পর্যায়ে হুযূর (আই.) ঘানাবাসীদের এই সুসংবাদ প্রদান করেন যে, ঘানার ভূমি হতে তেল নির্গত হবে। চার বছর পর ২০০৮ সনে খিলাফত শতবার্ষিকীর সময় যখন হুযূর আনোয়ার (আই.) পুনরায় যখন ঘানায় যান তখন ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে বলেন, হুযূর আপনি আপনার বিগত সফরের সময় বলেছিলেন, ঘানায় হতে পাওয়া যাবে। আনন্দের কথা হচ্ছে, গত বছর তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ঘানার প্রসিদ্ধ জাতীয় পত্রিকা 'উধরষু এৎধঢ়যরপ' এর ১৭ই এপ্রিল, ২০০৮ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে, "খলীফাতুল মসীহ্‌ ঘানায় তেল পাওয়া সম্পর্কেদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন। এই বিশ্বাসই গত বছর সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং ঘানার ভূগর্ভ হতে তেল নির্গত হয়েছে।"

অদৃশ্য হতে সাহায্য লাভের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

হযরত মৌলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এক সময়ের কথা, ঘটনাক্রমে ঘরের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন টাকা-পয়সা ছিল না এবং আমার স্ত্রী বলছিল, আগামীকালের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য কোন টাকা-পয়সা নেই। বাচ্চাদের বেতনও দেয়া হয় নি, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেতনের জন্য তাগাদা দিচ্ছে, অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। তিনি এসব কথা যখন বলছিল তখন আমার কাছে নির্দেশ আসে যে, তবলীগি কাজের উদ্দেশ্যে এক প্রতিনিধির সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এখনই অফিসে চলে আসুন। যখন আমি অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই তখন আমার স্ত্রী পুনরায় বলেন, আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য যাচ্ছেন অথচ ঘরে বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ এবং খরচাদির জন্য কোন ব্যবস্থাই নেই। আমি এই ছোট বাচ্চাদের জন্য কী ব্যবস্থা করব?

আমি বললাম, আমি জামাতের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমি তাকে সান্ত্বনা প্রদান করি, এতে আমার স্ত্রী নিরব হয়ে যায়।

আমি আল্লাহ্‌ তা'লার দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করতে করতে বাইরের দরজায় যাওয়ার আগেই বাহির হতে দরজায় কেউ কড়া নাড়ে। আমি এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেখি একজন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি এখনই আমাকে নগদ ১০০ টাকা দিয়ে বলল, এটা আপনার হাতে দিয়ে যেনঅনুরোধ করা হয় যে, আপনি যেন এটি প্রদানকারীর নাম কারো কাছে উল্লেখ না করেন।

আমি সেই টাকা গ্রহণ করে আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করি আর সেগুলোকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে পাঠাই এবং বাকি টাকা অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার হাতেই ঘরে পাঠিয়ে দেই। ফালহামদুলিল্লাহ আলা যালিক।" (হায়াতে কুদসী হতে সংগৃহীত, পৃ: ২৬৬-২৬৭)

আনুগত্য এবং ঐশী সাহায্য

ইমামের আনুগত্যের ফলে ঐশী সাহায্য লাভের সুমিষ্ট ফল কীভাবে লাভ হয় এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনুন–

হযরত শেখ মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুলতানে পাটওয়ারী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) তাকে নির্দেশ দেন যে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে দ্রুত চলে আসুন। আপনাকে আঞ্জুমানের সম্পত্তির 'মুখতারে আম'(অর্থাৎ,) নিযুক্ত করা হবে। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্রই চাকরী ছেড়ে দেন। স্ত্রী-সন্তানদের পাঠিয়ে দেন, গবাদি পশু বিক্রি করে দেন এবং সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ষ্টেশনে চলে আসেন এবং জিনিসপত্র বুক করার জন্য বুকিং ক্লার্কের কাছে যান। বুকিং ক্লার্ক বলেন, দুঃখিত, আমরা জিনিসপত্র বুকিং করতে পারব না। বুকিং তো যুদ্ধের কারণে কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। তিনি বাইরে এসে বসে পড়েন আর খোদা তা'লার সমীপে নিবেদন করেন, এখন এই অসহায় পথিক কোথায় যাবে! বিরান জায়গা, কারো সাথে পরিচয় নেই, না আছে কোন বন্ধু আর না কোন আত্মীয়-স্বজন। নিরূপায় হয়ে একাকী বসে আছি। স্ত্রী-সন্তানরা ইতোমধ্যে চলে গিয়েছে, তোমার খলীফার নির্দেশে এই সবকিছু করছি, কাজেই আমায় সাহায্য কর।

এরইমধ্যে একটি ছেলে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আপনি কি জিনিসপত্র বুকিং করাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! ছেলেটি বলল, আপনাকে বুকিং ক্লার্ক ডেকে পাঠিয়েছেন। বুকিং ক্লার্কের কাছে যাবার পর সে বলল, জনাব! আপনি অনেক সৌভাগ্যবান। দীর্ঘদিন যাবৎ জিনিসপত্রের বুকিং বন্ধ ছিল।

এইমাত্র টেলিগ্রাম এসেছে যে, এক্ষণই বুকিং খুলে দাও। জিনিসপত্র নিয়ে আসুন। তিনি জিনিসপত্র নিয়ে যান, বুকিং করান, রশিদ পকেটে রাখেন এবং গাড়ির অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে এসে বসেন। ১৫-২০ মিনিট অতিবাহিত হবার পর সেই ছেলেটি আবার আসে এবং বলে, আপনাকে বুকিং ক্লার্ক আবার ডাকছেন। তিনি যাবার পর বুকিং ক্লার্ক বলল, মিয়াঁ! আপনি কে বলুন তো! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন কী হয়েছে? বলল, আমি আপনার জিনিসপত্র বুকিং করা মাত্রই আবার টেলিগ্রাম আসে যে, ভুলক্রমে বুকিং খোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যদি কোন কিছুর বুকিং হয়ে যায় তবে সেগুলো ছাড়া বাকী সব বুকিং এখনই বন্ধ করে দাও। আপনি যেহেতু বুকিং করে ফেলেছিলেন সেহেতু আপনার জিনিসপত্র নিরাপদে পৌঁছে গেছে। (কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত আল্‌ফযল, ১৯-২১ এপ্রিল, ১৯৪৭)

আঙ্গুলও বেঁচে যায় আর আংটিও

ঐশী সাহায্য লাভের এক ঈমান সঞ্জীবনী ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আফ্রিকার আলাডা'র রাজা বর্ণনা করেন, "আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু" (অর্থাৎ, আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?) খঁচিত আংটি যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌রাবে (রাহে.) আমাকে দিয়েছিলেন তা আমার নিকট এতটাই প্রিয় হয়ে গিয়েছিল যে, তা পড়ার পর একবারের জন্যও আমি তা আর আঙ্গুল থেকে খুলি নি। সবসময় পড়ে রাখার কারণে আমার আঙ্গুলের অবস্থাও কিছুটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আংটি খোলার সময় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং তা খুলছিলও না। ডাক্তার আমাকে বলে, হয় আঙ্গুল কেটে ফেল, না হয় আংটি কেটে ফেল। কিন্তু আমি তো আংটি কাঁটতে চাচ্ছিলাম না কেননা ভয় হচ্ছিল, এতে আবার বরকত না কমে যায়। আর আঙ্গুলও কাটতে চাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি জায়নামায বিছিয়ে এভাবে দোয়া করি,

"হে খলীফাতুল মসীহ্‌র খোদা! তিনি আমাকে এই আংটি পড়িয়েছেন এবং আমি তা কাঁটতে চাচ্ছি না পাছে আবার বরকত বা কল্যাণ না কমে যায়।"

তিনি বলেন, দোয়া করার পর তিনি আবার চেষ্টা করেন। তখন আংটিটি খুব সহজেই আঙ্গুল থেকে খুলে আসে এবং কোনরূপ কষ্টই আর হয় নি। এরপর ডাক্তার আঙ্গুলেরও চিকিৎসা করে।' (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১)

হাত কাঁটতে বারণ করা

বেশ কয়েক বছর পূর্বে যখন কিনা সিয়েরালিওনেবিদ্রোহীরা গোটা দেশে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল সে সময় কীভাবে আল্লাহ্‌তা'লা এক আহমদী ছাত্রকে ঐশী সাহায্যের ঝলক দেখান এবং স্বীয় অপার অনুগ্রহে তাকে রক্ষা করেন, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল,"সিয়েরালিওন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থি ছাত্র মাহমুদ কোকা সাহেবকে বিদ্রোহীরা ধরে ফেলে এবং অন্যান্য বেসামরিক লোকের সাথে এক সারিতে দাঁড় করায় এবং এক এক করে হাত কাটতে শুরু করে। তারা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছিল যে, তারা তাদের হাত কোন জায়গা হতে কাটতে চায়? এরপর যে জায়গা তারা দেখিয়ে দিত সে জায়গা হতে কেটে দেয়া হত। এভাবে আট জনের হাত কেটে দেয়া হয়। আহমদী ছাত্রটি ছিল নয় নাম্বারে। যখন তার পালা আসে তখন বিদ্রোহীদের মধ্য হতেএকজন বলে উঠল, কমান্ডার হাত কাটতে নিষেধ করেছে, কে তোমাদেরকে হাত কাটতে বলেছে? কাজেই কমান্ডারের নির্দেশে অন্যদের আর হাত কাটা হয় নি। আর এভাবেই মাহমুদ কোকা সাহেব এবং তার পরে যারা ছিল তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করেন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১লা নভেম্বর, ১৯৯৯)

চলন্ত গাড়ি কাছে এসে হঠাৎ থেমে যায়

ঐশী সাহায্য লাভের এই বিস্ময়কর ঘটনাটি হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এর এক সাহাবী কারইয়াম নিবাসী হযরত হাজী গোলাম আহমদ সাহেব (রা.)-এর। ঘটনার বিবরণ হল, একবার একটি তবলীগি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে গড়ুহ শংকর যেতে হয়েছিল। কিন্তু রওয়ানা হতেই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। রেলগাড়ি হয়ত চলে গেছে এটি ভেবে তিনি রেল লাইনের পাশ ধরে পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হন। তখন জুন মাস এবং প্রচন্ড গরম ছিল। এদিকে প্রচন্ড রোদ। তিনি দোয়া করছিলেন যাতে কোন না কোন বাহন পাওয়া যায় আর তিনি সময়মত পৌঁছতে পারেন। হঠাৎ দেখেন, পিছন থেকে গড়ুহ শংকরগামী ট্রেন আসছে। আর সেই ট্রেনটি একদম তার কাছে এসেই দাঁড়ায়। তিনি ট্রেনে উঠে রেলের গার্ডকে ভাড়া প্রদান করেন এবং ট্রেন থামার কারণ জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, একজন যাত্রী তার রুটি বাঁধা থলেটিট্রেন থামানোর শিকলের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। রুটির থলেটি নেয়ার জন্য সে শিকলে টান দিলেট্রেনটি থেমে যায়। (দরবেশানে আহমদীয়াত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৫৪-৫৫)

ঐশী সাহায্য লাভের এই আকর্ষণীয় ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যে, সর্বশক্তিমান খোদা কীভাবে আর কোন উপায়ে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অসাধারণভাবে সাহায্য-সমর্থন করেন।

আহমদীয়া খিলাফতের কল্যাণ

সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামাতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনারূপী 'খিলাফতে রাশেদা আহমদীয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে এমনভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রসার হয়েছে যে, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিটি যুগ এত ব্যাপক ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে ভরপুরহয়ে আছে যেমনটি আকাশ তারকারাজিতে পরিপূর্ণ থাকে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক যুগের খলীফাকে ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও দোয়া গৃহীত হওয়ার মহা সম্মানে ভূষিত করেছেন যার কল্যাণ দ্বারা আহমদীদের ঝুলি পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আহমদীদের জীবনে ঐশী সাহায্য লাভের ঘটনা এত ব্যাপকহারে দৃষ্টিগোচর হয় যে, আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের বলতে পারি, আজ আহমদী মুসলমানদের এই সুমহান আধ্যাত্মিক সম্মেলনে এমন একজনও নেই যিনি আপন সত্তায়, নিজ বংশে অথবা স্বদেশে ঐশী সাহায্য লাভের কোন না কোন ঘটনা দর্শন না করেছে অথবা সে সম্পর্কে সে অবহিত নয়। এই কল্যাণ সেই আধ্যাত্মিক পুরষ্কাররূপী খিলাফতের মুকুটস্বরূপ, যা আল্লাহ্ তা'লা

নিজ কৃপায় শুধুমাত্র বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের শিরে পড়িয়েছেন। আর আমরা পরম বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সত্যতাস্বরূপ অবলীলায় উপস্থাপন করি।

আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভিন্ন পাতায়

সন্মানিত শ্রোতামন্ডলী! এসব ঘটনাযা আপনারা শ্রবণ করেছেন তা ছিল ছিল ব্যক্তিগত ঘটনা। প্রতিটি ঘটনা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ বহণ করে। এছাড়াও আহমদীয়া খিলাফতের ১০৯ বছরের ইতিহাসের প্রতিটি যুগ জামা'তবদ্ধভাবেও ঐশী সাহায্য লাভের বিকাশ অত্যন্ত মহিমার সাথে ঘটেছে এবং এ ধারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখনো বহাল আছে এবং সর্বদা বহাল থাকবে। এবার চলুন! এই আশিসময় ইতিহাসের ওপর ভাসা ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে দেখি।

প্রথমযখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কতেক লোক খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রীকখিলাফত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে জামাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু মু'মিনদের জামাত যুগ খলীফার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই নৈরাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। খিলাফতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস চিরদিনের জন্য আহমদীদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং প্রোথিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় খিলাফতের সময় বিভিন্ন নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছিল। শান্তির বার্তা দেওয়ার নামে বিভেদ সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু জামাত সীসা-গলিত প্রাচীরের ন্যায় খিলাফতরূপী নিয়ামতের ছায়ায় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। আহরারীদের নৈরাজ্য অত্যন্ত জোরালোভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং অতীতের রূপকথায় পর্যবসিত হয়। অপরদিকে আহমদীয়া জামাত তাহরীকে জাদীদের কল্যাণে বিশ্বের প্রান্তে-প্রান্তে বিস্তার লাভ করতে থাকে। কাদিয়ান হতে হিজরতের সময় এলে ঐশী সাহায্য-সমর্থন রাবওয়ারূপে নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবাইকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে দেয়। সমগ্র দেশে বিরোধিতার ঝড় উঠে কিন্তু জামাত খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ছায়ায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকে।

তৃতীয় খিলাফতের সময় জামাতের বিরোধিতা আরো বৃদ্ধি পায়। আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধেনির্যাতনমূলক আইন প্রবর্তনের ফলে বিরুদ্ধবাদীরা আনন্দের নাচ নাচতে থাকে। সে সময়ের শাসক এই দম্ভোক্তি করে যে, আমার গদি অনেক মজবুত এবং আমি জামাতের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিব। কিন্তু ঐশী সাহায্যের বিকাশ দেখুন! সেই অহংকারী শাসকের জীবন বাঁচানোর জন্য তার অনুচররা হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে তার জীবন ভিক্ষা চেয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু সে ফাঁসি-কাষ্ঠ বাঁচতে পারে নি। আর চিরকালের জন্য সে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।

চতুর্থ খিলাফতের সময় আরেক অত্যাচারী ও স্বৈরশাসক জোর করে কালা-কানুন প্রয়োগ করার মাধ্যমে জামাতের জীবন-যাত্রাকে সংকীর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। চরম বৈরিতাপূর্ণ পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও যুগ খলীফার ফিরিশ্‌তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দেশ থেকে নিরাপদে হিজরত করা ঐশী সাহায্য লাভের জীবন্ত নিদর্শন। সেই শাসক দম্ভভরে একথাও বলেছিল যে, আহমদীয়াত হল এক প্রকার ক্যান্সার। আর আমার সরকার একে সমূলে উৎপাটন করবে। কিন্তু ঐশী সাহায্যের একটি শক্তিশালী বিকাশই তাকে ভুল অক্ষরের ন্যায় এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। খোদার ক্রোধের আগুনে সে এমনভাবে ভস্মীভূত হয়েছে যে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে নি।

এরপর পঞ্চম খিলাফতে আশিসময় যুগের সূচনা হয়। আহমদীয়া জামাতের উন্নতির ধারা যা প্রত্যেক খিলাফতের যুগে বহাল ছিল তা সমগ্র বিশ্বে এমনভাবে উন্নতি লাভ করে যে, যুগ খলীফারআহ্বান আজ যুগের ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। জামাতের একটি বিশ্বজনীন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম এবং বিশ্বশান্তির বাণী এত অধিক ও ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করে যে, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাসমূহে সেই ধ্বনি উচ্চকিত হতে থাকে। যুগের ইমাম পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এমন সুখ্যাতি এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন যে, পৃথিবীবাসীর চোখ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেছে এবং 'নুসিরতু বির্‌রু'বি'র (অনুবাদক–আমাকে প্রভাব-বিস্তারী ক্ষমতা দান করা হয়েছে) দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসী বার বার দর্শন করেছে। আহমদীয়া জামাতের শহীদগণ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাদের পবিত্র রক্তের কল্যাণে এবং ঐশী সাহায্যের সুবাদে আহমদীয়াতের বৃক্ষ সমগ্র পৃথিবীতে ডালপালা বিস্তার করেছে। শত্রুরা পূর্বের চেয়ে আরো বেশি হিংসার অনলে জ্বলছে কিন্তু কে এমন আছে যে খোদার সাহায্য ও সমর্থনের পথে বাঁধ সাধতে পারে?

উপসংহার

প্রিয় সুধি! ঐশী সাহায্য লাভের অকূল সমুদ্র হতে মাত্র কয়েকটি বিন্দু আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করতে পেরেছি। এটি এমন একটি বিষয় যা আয়ত্ত বা সংকুলান করা অসম্ভব। ঐশী সাহায্য লাভের কল্যাণধারাবহাল আছে এবং সর্বদা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকবে। পরিশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি তত্ত্বপূর্ণ উক্তি উপস্থাপন করছি। তিনি কীরূপ জোরালো ও প্রতাপের সাথে বলেছেন, "খোদা তা'লা নিজ সাহায্য-সমর্থন এবং স্বীয় নিদর্শনাবলীকে এখনও শেষ করেন নি। আর আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, আমার সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত দিবেন না। অতএব, হে লোক সকল! যারা আমার আওয়াজ শুনছ, খোদাকে ভয় কর এবং সীমালঙ্ঘন করো না। এই পরিকল্পনা যদি কোন মানুষের হত তাহলে খোদা তা'লা আমাকে ধ্বংস করে দিতেন এবং এসব কর্মকাণ্ডের কোন নাম-গন্ধই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু, তোমরা দেখেছ, কীভাবে খোদা তা'লার সাহায্য সমর্থন আমার সাথে রয়েছে আর এত বেশি নিদর্শন অবতীর্ণ হয়েছে যা গণনাতীত...হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! কিছু তো বিবেক খাটাও, খোদা তা'লা মিথ্যাবাদীদের সাথে এমন আচরণ করেন কী?" (হকীকাতুল ওহীর পরিশিষ্ট, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খন্ড, পৃ: ৫৫৪)

ওয়া আখেরুদ দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

ঐশী সাহায্য প্রত্যাশী
আতাউল মুজিব রাশেদ
২০/০৭/২০১৭

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**, লন্ডন

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২১তম কিস্তি)

অশুভ বা মন্দের উৎসাদন: একটি সম্মিলিত দায়িত্ব

জনগণকে (এ ব্যাপারে) শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত নয়। এটা জনগণের নিজেদেরই সম্মিলিত দায়িত্ব যে, তারা নিজেরা ভাল কাজ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

আধুনিক উন্নত সমাজগুলোতে ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট থেকে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করার এবং সেগুলো সরিযে ফেলার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোতে গৃহকর্ত্রীরা তাদের ঘরের ময়লা আবর্জনা সরাসরি রাস্তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যার ফলে ময়লা আবর্জনা জমতে জমতে রাস্তাগুলো ভরে ওঠে এবং সেগুলো তখন আর চলাচলের উপযোগী থাকে না।

বাড়ীর লোকজন অবশ্যই তাদের ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। কিন্তু, পথঘাটও তো পরিষ্কার রাখার কোন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

একটা দুঃখবহ ব্যাপার হচ্ছে, পাশ্চাত্য যদিও সামাজিক দায়িত্বের এই গুরুত্বটা উপলব্ধি করে যে, জনসাধারণের সমাগম হওয়ার স্থানগুলোকে অর্থাৎ পাবলিক প্লেসগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত এই দায়িত্বের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, সমাজকে অপরাধী মানব-আবর্জনা থেকেও পরিষ্কার রাখতে হবে। কেননা, এই আবর্জনাই তো প্রত্যহ ঘর থেকে নির্গত হয়ে পথঘাট ও পাবলিক প্লেসগুলোকে নোংরা করে তুলছে। ইসলাম এই প্রশ্নটাকে আরও ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে। সামাজিক আবর্জনা কমিয়ে ফেলার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিবারের বড়দর উপরেই বর্তায়, যাতে সমাজের প্রতি মন্দ অপেক্ষা ভাল অনেক বেশি করে করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম সমাজের উপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, সমাজ ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে অশুভ বা মন্দের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করবে। তবে, এই জেহাদ না তরবারির, না নিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়নের। ধৈর্য সহকারে সতর্ক করা উপদেশ দেওয়া বা নসিহত করা এবং সুপরামর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে, কুরআন করীমের মতে, সামাজিক অশুভ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার সর্বোত্তম পন্থা।

এবং তোমাদের মধ্যে এমন এক জামাত থাকা দরকার যারা (সর্বদা মানুষকে ভাল কাজ করার জন্য উপদেশ দিবে এবং) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে; এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে, এবং অসঙ্গত কাজ করতে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ এরাই সফকাম (অর্থাৎ এই ধরনের সমাজগুলোই টিকে থাকবে। এখানে 'মুফলেহূন' শব্দটির অর্থ এও হতে পারে যে, 'যারা উত্তরণের যোগ্যতম')। (আলে ইমরান, ৩:১০৫)

উপরোক্ত আয়াতে করীমা থেকে এটা আন্দাজ করা ঠিক হবে না যে, জনস্বাস্থ্য ও জনহিতকর কার্যাদির রক্ষা ও পরিচালনার যে ইসলামী প্রয়াস, তা সম্পূর্ণরূপেই বেসরকারী এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কিছুই নেই। অবশ্যই , আইনের প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ একান্তভাবেই রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু, আমি যে বিষয়টার উপরে জোর দিতে চাচ্ছি,তা শুধু এটাই যে, ইসলামের মতে, অপরাধ দমন, নিবারণ বা কমানোর জন্য রাষ্ট্রীয়যন্ত্র একা যথেষ্ট নয়। ঘরে

এবং সমাজে একবার অপরাধ প্রবণতাকে সৃষ্টি হতে দিলে বা প্রসার লাভ করতে দিলে, একটা সরকার সবচেয়ে বেশি যতটা করতে পারে তা হচ্ছে, এর শুধু উপসর্গগুলোকেই সময় সময় উৎখাত করে ফেলতে পারে। অশুভ বা মন্দের মূল কারণ এত বেশি গভীরে নিহিত যে, সেখানে আইনের লম্বা হাতও পৌঁছতে পারে না। তাই, প্রতিটি সমাজের সকল পরিবার, ধর্মীয় নেতা ও জননেতাদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে সমাজ থেকে অশুভের উৎপাটন করা।

এই আয়াত এবং আরও কতিপয় আয়াতের আলোকে হযরত রসূলে করীম (সা.) একবার ঘোষণা করেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা বিয়োগান্ত পরিণতির শিকারে পরিণত হয়েছিল এই জন্য যে, তারা তাদের কর্তৃপক্ষকে অমান্য করেছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। তারা একে অপরকে অন্যায় ও বেইনসাফী করা থেকে প্রতিহত করেনি।

তিনি আরও বলেছেন, 'অবশ্যই, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা ভাল কাজ ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং মন্দ কাজ ও অকল্যাণ কাজ করতে নিষেধ করবে। দুষ্কৃতকারীর হাত ধরে ফেলো এবং তাকে সৎভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ কর; তাকে সৎপথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায়, আল্লাহ্ তোমাদের কতকের হৃদয়কে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে জড়ায়ে ফেলবেন এবং তিনি তোমাদেরকেও তাদের মতই অভিশপ্ত করবেন।" (আবুদাউদ ও তিরমিযী: রিয়াযুস সালেহীন-১৯৮, পৃ. ৫০)

হযরত রসূল পাক (স.)-এর মতানুসারে, একটা জাতির অধঃপতনের অতি মারাত্মক কারণগুলোর মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা প্রকাশ্যে সংঘটিত বা প্রদর্শিত হলেও তার প্রতি জনগণের অসন্তোষ প্রকাশের সাহস হারিয়ে ফেলা। রসূলে পাক (সা.) এক হাদীসে এই ধরণের সমাজের সঙ্গে একটা জাহাজের আরোহীদের তুলনা করেছেন এই ভাবে:

'নোমান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন; যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমাকে মেনে চলে এবং যারা সেই সীমা সম্পর্কে গাফেল থাকে, তাদের উপমা সেই জাহাজের সেই যাত্রীদের ন্যায়, যারা লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কারা জাহাজের উপরের ডেকে অবস্থান নিবে এবং কারা নীচের ডেকে। এবং এভাবেই তারা তাদের স্থান ঠিক করে নেয়। যারা জাহাজের উপরের ডেকে স্থান নিয়েছিল তাদের পক্ষে পানির কাছে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোন পথ ছিল না। কাজেই, পানি আনার জন্য তাদেরকে বারবার উঠানামা করতে হতো, এবং এতে করে নীচের ডেকে অবস্থান গ্রহণকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হতো।

একবার তারা নীচের ডেকের লোকদের কাছে এই প্রস্তাব দিল যে, তাদের আপত্তি না থাকলে তারা, 'উপরের ডেকেরে লোকেরা জাহাজের তলদেশের বা পাটাতনে একটা গর্ত বা ফোঁকড় করে নিবে, যাতে তারা সরাসরি পানি সংগ্রহ করতে পারে। এখন, যদি জাহাজের নীচের ডেকের লোকেরা অন্যদেরকে তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে দেয়, তাহলে তারা সবাই একত্রে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি তারা এ কাজ করতে না দেয়, তাহলে তারা সবাই বেঁচে যাবে।' (বুখারী রিয়াযুস সালেহীন-১৮৯, পৃ. ৪৮)

আমার ভয় হয়, এই উপমাটি যেন আজকের পৃথিবীর সমাজগুলোর জন্যই প্রযোজ্য।

'কর' এবং 'কর' না (আদেশ ও নিষেধ)

কুরআন করীমের আরও যে সকল আয়াতে, শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক সামাজিক দায়িত্বাবলীর কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে:

"এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তারাই যারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা কোন বিবাদ না করে বলে 'সালাম'।" (আল-ফুরকান-২৫:৬৪)

"এবং যখন তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা তা থেকে আরও উত্তম সাদর-সম্ভাষণ জানাও, অথবা (কমপক্ষে) তা-ই প্রত্যার্পণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (আন্ নিসা-৪:৮৭)

এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে গাল ফুলিও না, এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলিও না, কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না। এবং তুমি নিজ চালচলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রেখো, নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর সর্বাধিক কর্কশ।" (সূরা লোকমান-৩১:১৯, ২০)

ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে যে ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে চায় তা এমনিতেই স্বয়ং দায়িত্বহীন আচরণ ও অপরাধ প্রতিহত করে। ইসলাম এমন এক প্রকার সুস্থ যমীন সৃষ্টি করে যা আদতেই জীবাণু ও আগাছার বৃদ্ধি নাশ করে।এই লক্ষ্য অর্জণের জন্য অত্যন্ত বিস্তারিত এবং ব্যাপক শিক্ষা দান করা হয়েছে- 'কর' এবং 'কর' না অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধের আকারে, যার সংখ্যা অন্ততঃ কয়েকশ হবে। এই শিক্ষার যে গূঢ়মর্ম তা প্রায় সকল ধর্মেই অভিন্ন। এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের মতাদর্শগত পার্থক্য তুলে ধরার পরিবর্তে, আমি এখানে আপনাদের সামনে, এ সকল অভিন্ন শিক্ষার গুটি কতকের ব্যাপারে কুরআন করীমের হাওয়ালা পেশ করবো:

'কর (আদেশ):

সতীত্ব: ১৭:৩৩; ২৩:৬-৮; ২৪:৩১; ৩৪, ৬১; ২৫:৬৯; ৩৩:৩৬; ৭০:৩০-৩২

পাক-সাফ: ২:২২৩; ৪:৪৪; ৫:৭; ২২:৩০; ৭৪:৫, ৬
ক্রোধ-দমন: ৩:১৩৫
সহযোগিতা: ৫:৩
সাহস: ২:১৭৮; ৩:১৭৩-১৭৫; ৯:৪০; ২০:৭৩-৭৪; ৩৩:৪০; ৪৬:১৪
সৎকাজ: ২:১৯৬; ৩:১৩৫; ৫:৯৪; ৭:৫৭
শুভের প্রতি আহ্বান ও অশুভের বারণ: ৩:১১১
সৎকাজে প্রতিযোগিতা: ২:১৪৯
আমানত রক্ষা: ২:২৮৪; ৪:৫৯; ২৩:৯; ৭০:৩৩
ক্ষুধিতকে অন্নদান: ৭৬:৯; ৯০:১৫-১৭
ক্ষমা: ২:১১০; ৩:১৩৫, ১৬০; ৪:১৫০; ৫:৭, ৯০; ১৪:৮; ৩৯:৮, ৬৭; ৪৬:১৬
সত্যসাক্ষ্য দান: ৪:১৩৬; ৫:৯; ২৫:৭৩
কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা: ৪:৩৭
প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার: ৪:৩৭
আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহারঃ ২:১৭৮; ১৬:৯১; ৩০:৩৯
কৃতজ্ঞতা: ২:১৫৩; ১৭৩, ১৮৬, ২৪৪; ৩:১৪৫; ৫:৭, ৯০; ১৪:৮; ৩৯:৮, ৬৭; ৪৬:১৬
বিনয়: ৬:৬৪; ৭:১৪, ৫৬, ১৪৭; ১৬:২৪, ৩০; ১৭:৩৮; ২৮:৮৪; ৩১:১৯, ২০; ৪০:৩৬
সুবিচার: ৫:৯; ৬:১৫৩; ১৬:৯১; ৪৯:১০
জনগণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা: ৪:১১৫; ৪৯:১০
ধৈর্য: ২:৪৬, ১৫৪, ১৫৬, ১৭৮; ১১:১২; ১৩:২৩; ১৬:১২৭-১২৮; ২৮:৮১; ২৯:৬১; ৩৯:১১; ৪২:৪৪; ১০৩:৪
অধ্যবসায়: ১৩:২৩; ৪১:৩১-৩৩
পবিত্রতা: ২:২২৩; ৫:৭; ৯:১০৩, ১০৮; ২৪:২২; ৩৩:৩৪; ৭৪:৫; ৮৭:১৫; ৯১:১০, ১১
আত্ম-সংযম: ৪:১৩৬; ৭:২০২; ১৮:২৯; ৩০:৩০; ৩৮:২৭; ৭৯:৪১-৪২
এখ্‌লাস বা একনিষ্ঠতা : ৩৯:৩, ৪; ৯৮:৬; ১০৭:৫-৭
সত্যবাদিতা: ৪:১৩৬; ৫:১২০; ৯:১১৯; ১৭:৮২; ২২:৩১; ২৫;৭৩; ৩৩:২৫, ৩৬৭১; ৩৯:৩৩
নিঃস্বার্থপরতা: ২:২০৮, ২৬৩; ১১:৫২; ৫৯:১০; ৬৪:১৭; ৭৬:৯, ১০; ৯২:২০, ২১

'কর না' (নিষেধ):

জিনা বা ব্যভিচার: ১৭:৩৩
উগ্রতা: ২:৩৫, ৮৮; ৪:১৭৪ ;৭:৩৭
গীবত বা পরনিন্দা, পরচর্চা: ৪৯:১৩
গর্ব, দম্ভ: ৫৭:২৪
মানহানি: ৪৯:১২
উপহাস: ৪৯:১২
হতাশা: ৩৯:৫৪
হিংসা, ঈর্ষা: ১১৩:৬
অপব্যয়: ৭:৩২; ১৭:২৭, ২৮
কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও অনুসরণ: ১৭:৩৭
ঔদ্ধত্য: ১৭:৩৮; ২৩:৪৭; ৩১:১৯
মাপে কম দেওয়া: ৮৩:২-৪
অবজ্ঞাসূচক উপনাম দেওয়া: ৪৯:১২
কৃপণতা: ৪:৩৮; ৪৭:৩৯; ৫৭:২-৫; ৫৯:১০; ৬৪:১৭
অবিশ্বস্ততা; বিশ্বসঘাতকতা: ৪:১০৬, ১০৮; ৮:২৮,৫৯
সন্দেহ: ৪৯:১৩
মিথ্যা বলা: ২২:৩১; ২৫:৭৩
চুরি: ৫:৩৯

ইসলাম প্রত্যেক ধর্মের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানায় সবাই মিলে এক সাথে সমাজে ভাল বা শুভকে উদ্বুদ্ধ করতে, তার প্রসার ঘটাতে, চর্চা করতে; এবং মন্দ বা অশুভ থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার উপদেশ দিতে, সতর্ক করতে।

এমন যদি হতো, তাহলে পৃথিবীটা কতই না সুন্দর হতো!

(চলবে)

বিশেষ দোয়ার এলান

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতু। আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের একমাত্র কন্যা 'আফিয়া আহমদ সপ্তর্ষী' ওয়াকফে নও, সে আড়াই বছর বয়সে পায়ে ব্যাথা পেয়ে দেশের বিভিন্ন অর্থোপেডিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল। এরপর ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়ার ভেলোরের 'সি.এম.সি' হাসপাতালে তার পায়ের অপারেশন হয়। মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা এবং সকল আহমদীর দোয়ার বরকতে অপারেশন ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এবং শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.)-এর সদয় অনুমতিক্রমে পুনরায় চেকআপের জন্য আগামী ১১ জানুয়ারি ২০১৮ ইন্ডিয়ার ভেলোরের উদ্দেশ্যে রৌনা দিব, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের এ সফর যেন নিরাপদ হয় এবং সপ্তর্ষীর পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূর জন্য সকলের কাছে পুনরায় বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মাহমুদ আহমদ সুমন
ওয়াকেফে জিন্দেগী
বাংলাডেস্ক, ঢাকা

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১১তম কিস্তি)

হযরত শেখ কাজিমুর রহমান কপুরথলাওয়ালে (রা.) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। তিনি সদর আঞ্জুমানে কর্মরত থেকে অবসর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনেকবার তাঁর বাসায় গিয়ে দোয়া চেয়েছি। একবার তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমার প্রথমবার যখন তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল, তাঁর ফরমায়েশে বাজার থেকে বরফ এনে দিয়েছিলাম। সাথে আমার পক্ষ থেকে এক বোতল শরবত নিয়ে এসেছিলাম। গরমের দিন রাবওয়াতে এত গরম হত যে, বাড়িতে বিশেষ ব্যবস্থায় বরফ এনে রাখতে হত, যেন পানিতে মিশিয়ে পান করা যায়। নতুবা গরম পানি পান করতে খুব কষ্ট হত। যখন তাঁর ইন্তেকালের খবর পেয়ে তাঁর বাসায় গেলাম, দেখলাম তাঁর সর্বশেষ গোসলের প্রস্তুতি চলছে। যারা তাঁর মরদেহ গোসল করাবেন আমাকেও এই পূণ্যকর্মে শামিল করে নিলেন। আমি জীবনে একজনের মরদেহ গোসলে অংশ নিয়েছি, আর তিনি ছিলেন এই বুযূর্গ সাহাবী।

কপুরথলায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় জামাত ছিল। অনেকগুলো পরিবার হুযুর (আ.) এর হাতে বয়াত গ্রহনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কপুরথলা জামাতের বড় গৌরবময় এক ইতিহাস আছে। শেখ কাজিমুর রহমান সাহেবগণ সাত ভাই ছিলেন। আমি তাদের তিন ভাইয়ের সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

শেখ মুহিব্বুর রহমান (রা.) শেখ কাজিমুর রহমান সাহেবের ভাই ছিলেন। তিনি শেষ বয়স দারুল উলুম মহল্লায় নিজ বাড়িতে কাটিয়েছেন। তাঁর সাথে বার বার দেখা করেছি। একবার আমি যখন দেখা করতে গিয়েছি তখন আমার কোন একটা পরীক্ষা ছিল। তাঁর কাছে দোয়া চেয়েছিলাম। এরপর দীর্ঘদিন আর দেখা করতে যাওয়া হয়নি। এরপর যখন গেলাম তখন ঘোরতর আপত্তি করলেন– আপনি পরীক্ষার জন্য দোয়া করতে বলে চলে গেলেন, এরপর আর কোন খবর নাই। আমি দোয়া করে যাচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এতদিনে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আপনি আমাকে কেন জানালেন না যে, পরীক্ষার ফল কি হল? আমি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলাম। বুঝতে পারলাম, সাহাবাগণ কত মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব সহকারে দোয়া করতেন এবং অপেক্ষায় থাকতেন যে, দোয়ার ফল কী হয়েছে।

হযরত শেখ মুহিব্বুর রহমান (রা.) আমাকে বড় ভারী ওজনের একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন। আমি সব সময় ঐ দোয়া করতে থাকি। তিনি বললেন, দোয়া করবেন: "হে আল্লাহ্! আমি বড় গুনাহ্গার। আমার কোন নেকী নাই। শুধু গুনাহ্ করেই চলেছি। হে আল্লাহ্! আমি একটি মাত্র নেকী করতে পেরেছি। আর তা হল, আমি তোমার মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছি। আর এই কারণে মানুষ আমাকে মির্যায়ী বা কাদিয়ানী কাফের বলে গালি দেয়। মুসলমান হয়ে কাফের গালি শুনতে বড় কষ্ট হয়। হে আল্লাহ্! আমার কেবলমাত্র এই একটি পূণ্যের কারণে আমার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।" আমার কাছে এটি খুবই প্রভাবসৃষ্টিকারী একটি দোয়া বলে মনে হল।

হযরত শেখ লতিফুর রহমান (রা.) শেখ মুহিব্বুর রহমান (রা.) এর সর্বকনিষ্ঠ ভাই ছিলেন। দারুর রহমত মহল্লার পশ্চিম প্রান্তে তাঁর বাড়ি ছিল। তারপরই ফ্যাক্টরী এরিয়া মহল্লা- তৎকালীন রাবওয়ার শেষ মহল্লা। ফ্যাক্টরী এরিয়া মহল্লায় আমাদের শিক্ষক মাওলানা গোলাম বারী সাইফ সাহেবের বাড়ি ছিল। তাঁর আশে পাশেই মাওলানা আতাউল্লাহ্ কলিম সাহেবের বাড়ি ছিল। আতাউল্লাহ্ কলিম বড় বুযূর্গ ছিলেন। তিনি একাধারে পশ্চিম আফ্রিকা ঘানা, এরপর আমেরিকা, ফিলিস্তিন, তারপর পশ্চিম জার্মানির মোবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন। কিছুকাল জামেয়া আহমদীয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালও ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সাহাবায়ে কেরামের যতজনের সাথে দেখা হয়েছে সবার মাঝে এমন কিছু গুণাবলী দেখেছি যদ্বারা বোঝা যায় যে তাঁরা বিশেষ ধরনের বিশেষ চরিত্রের মানুষ। অন্যদের তুলনায় তাঁরা অবশ্যই বেশী কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী।

হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার(রাঃ) পিতা মুনশী শেখ জাফর আহমদ(রাঃ) কপুরথলার সাথে বহুবার সাক্ষাৎ করেছি। মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব আমীর

সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব এর সাথে লেখক।
মাঝে মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব, বামে মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব, লেখক ডানে।

বাংলাদেশের সাথে তাঁর বাড়ি লায়েলপুর গিয়ে নিমন্ত্রণও খেয়েছি। তিনি ফয়সালাবাদের আমীর ছিলেন শুরু থেকে। তিনি ফার্সি ভাষায় বড় আলেম ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক বড় যুগান্তকারী ঘোষনা "আরবী সকল ভাষার মা বা উৎস" এর উপর হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার (রা.) ৪০টিরও বেশি ভাষায় গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ ভাষাগুলো আরবী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন ইংরেজী ভাষা। শেষ যুগে সংস্কৃত ভাষায় গবেষনা করেছেন। তারপর বাংলা ভাষায় আরম্ভ করেছিলেন। এ কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে আমার শোনা।

হযরত সুফি গোলাম মোহাম্মদ (রা.) নাযের বাইতুল মাল (খরচ) ছিলেন। পরে আরোও উন্নতি করেছিলেন। চৌধুরী মোবারক মুসলেহ্ উদ্দীন মরহুম উকিলুল মাল সানী ও পরে উকিলুত তালিম, তাঁর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। সুফি সাহেবকে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির কারনে সুফি বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল তিনি মসজিদ মোবারকে ফজরের নামায পড়িয়েছেন। দরবেশ ধরণের মানুষ ছিলেন,কম কথা বলতেন। প্রথম যুগে কাদিয়ানে জামেয়া আহমদীয়ার হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

হযরত মৌলভী মুহাম্মদ দীন(রা.) আলবেনীয়ায় মোবাল্লেগ ছিলেন। পরে আমাদের সময় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সুস্থ সবল থাকতে অফিসে আসতেন। পরে অফিসে আসতে পারতেন না। তারপরও তিনি সদর ছিলেন। কর্মচারীরা কাগজ পত্র বাসায় নিয়ে যেতেন। তিনি দেখে স্বাক্ষর করতেন।

খাকসার তাঁর অফিসেও দেখা করতাম। পরে তাঁর বাসায় গিয়ে বহুবার দেখা করেছি। তিনি বরাবর আমার জন্য দোয়া করে গেছেন। খুব আদর করতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, ১৯০৭ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন জীবন উৎসর্গ করার তাহ্‌রীক করলেন তিনি তখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পড়তেন। তিনিও জীবন উৎসর্গ করে হযরত (আ.)-এর খেদমতে আবেদন করলেন। হযরত(আ.) তাঁর আবেদন পড়েই অনুমোদন করলেন এবং বললেন, এমন যুবকদেরই জীবন উৎসর্গ করা উচিত। মৌলভী সাহেব নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে করতেন যে, তিনি হযরত (আ.)-এর হাতে হাত রেখে বয়াত করেছেন। তারপর জীবন উৎসর্গ করেছেন।

একবার মৌলভী সাহেবের ঘাড়ে একটা বিষফোঁড়া উঠেছিল। তিনি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে দোয়ার আবেদন করলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। হযরত (আ.) মৌলভী সাহেবের ঘাড়ে হাত দিয়ে (মাসাহ্) মুছে দিলেন, দোয়া করলেন; হুযুর (আ.) বললেন, ভাল হয়ে যাবে। এভাবেই মৌলভী সাহেবের ঘাড়ের ফোঁড়া ভাল হয়ে গিয়েছিল। মৌলভী সাহেব প্রায় একশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

একজন হাজী আব্দুল করীম (রা.) করাচীতে অবস্থান করতেন। রমযান মাস রাবওয়া কাটাতেন। প্রতিদিন যোহরের নামাযের পর মসজিদে মোবারকে কুরআন মজীদের দরস হত। তিনি মসজিদে মোবারকে বসে দরস শুনতেন। আমরা অনেক সময় তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন করতাম।

হযরত মৌলভী গোলাম আহমদ বদ্দোমালহি (রা.) একজন সাহাবী ছিলেন, আলেম ও মোবাল্লেগ ছিলেন। এক সময় আফ্রিকার কোন এক দেশে মোবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হযরত মৌলভী সাহেবকে রমযান মাসে মসজিদে মোবারকে কুরআন শরীফের দরস দিতে দেখেছি, শুনেছি। ইসলামের যে কোন শিক্ষা কুরআনের ব্যাখ্যার সময় খুব স্পষ্ট করে খোলাখুলি বলতেন।

হযরত মৌলভী মুহম্মদ হোসেন, একজন সাহাবী ছিলেন, জামাতের মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। "সবুজ পাগড়ীওয়ালে" বলে পরিচিত ছিলেন। অনেক বার দেখা হয়েছে।

আমার বড় মেয়ে কুররাতুল আয়েন সাদিয়া ছয় বছর বয়সে কুরআন খতম দিলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবর্তন করা নিয়মানুসারে আমাদের বাসা, তাহ্‌রীকে জাদীদের কোয়ার্টারে 'আমীন' অনুষ্ঠান করেছিলাম। হযরত মৌলভী মুহম্মদ হোসেন সাহেব (রা.)-কে আহ্বান করেছিলাম। তিনি আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়ে আমার মেয়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনে দোয়া পরিচালনা করেছিলেন। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের বাসায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খানদানের কয়েকজন বুযুর্গ মহিলা এসেছিলেন। মোহতরমা ছোটি আপা সৈয়্যদা মরিয়ম সিদ্দিকা বেগম সাহেবা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.), মোহতরমা আপা তাহেরা সিদ্দিকা নাসের বেগম সাহেবা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং মোহতরমা আমাতুল বাসেত সাহেবা বেগম সৈয়দ মীর দাউদ

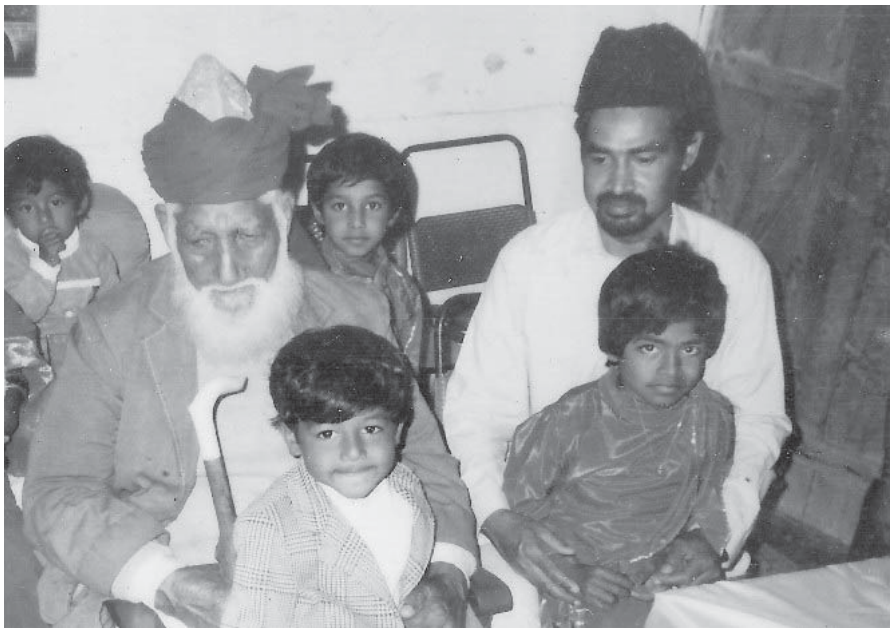

কুররাতুল আয়েনের আমীন অনুষ্ঠানে হযরত মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন (রা.) পাগড়ীওয়ালে, ডানে লেখক, লেখকের কোলে কুররাতুল আয়েন

আহমদ মরহুম এসেছিলেন। সবাই আমার মেয়ের জন্য দোয়া করেছেন। মেয়ের মামা মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে মিষ্টি, চা নাশতা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলাম। আমাদের জামেয়ার ছাত্র মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব, মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবরা মেহমানদারীতে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মৌলভী মুহম্মদ হোসেন সাহেব (রা.)-এর সাথে ফটোও বানিয়েছিলাম। ঐ যুগে সেখানে সবাইকে মৌলভী সাহেব বলা হতো। মওলানা বলার রীতি ছিল না।

মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের সাথে বহুবার সাক্ষাত করেছি। একদিন দুপুরে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করে খাবার পরিবেশনের সুযোগও পেয়েছি। একবার মৌলভী সাহেবকে মুহাম্মদী বেগম সম্পর্কিত হযরত (আ.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি খুব সহজে সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন।

হযরত চৌধুরী আলী মুহাম্মদ বি.এ.বি.টি.-এর সাথে দু'বার সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি ১৯০৫ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর পৌত্র জনাব লর্ড আহমদ তারেক মাহমুদ বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের লর্ড সভার সদস্য এবং একজন মন্ত্রী। জামাতের খেদমতেও অনেক এগিয়ে আছেন।

আমার মনে আছে সবার শেষে যে সাহাবী ইন্তেকাল করেছিলেন তাঁর সাথেও দেখা করেছিলাম। তিনি রাবওয়া দারুল উলুম মহল্লায় বসবাস করতেন। তাঁর নাম স্মরণ আসছে না।

মৌলভী যহুর হোসেন সাহেবের (মোবল্লেগ বুখারা, রাশিয়া) বাড়ি গিয়ে দেখা করেছি। তিনি রাশিয়ার প্রথম মোবাল্লেগ ছিলেন। রাশিয়া সরকারের পুলিশ তাঁকে গুপ্তচর হিসেবে গ্রেফতার করে জেলে রেখেছিল। জেলে প্রায় দু'বছরের বেশি সময় নির্যাতন সহ্য করেছেন। যখন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তখন তিনি খুবই অসুস্থ্য ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর নির্যাতনের অনেক ঘটনা শুনিয়েছেন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের ক্ষত চি হ্ন আমাকে দেখিয়েছিলেন। মৌলভী সাহেব মসজিদে মোবারকে রমযান মাসে দরসে কুরআন দিতেন। অনেক কাঁদতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর নযম অনেক শোনাতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযমের পংক্তিগুলো অনেক গভীর অর্থ বহন করে। অনেক কথা না বলে একটি পংক্তি বলে দিলে কাজ হয়ে যায়।

২০০৫ সালে কাদিয়ানের জলসা সালানায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার স্ত্রী আমাতুল কুদ্দুস শাহানা আমার সাথে ছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আ.)-এর সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম। হুযুরের সাথে আমাদের ফটো আছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-কে দীর্ঘজীবি করুন। বড় বড় বিজয় দান করুন।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কাদিয়ানের বুযুর্গ দরবেশগণের সাথে দেখা করেছি। কয়েক জন সাহাবীর সাথেও দেখা করেছি। কাদিয়ানের দরবেশগণের অসাধারণ কুরবানি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁদের সাথে দেখা হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব মরহুম কাদিয়ানের আমীরে মোকামী এবং নাযেরে আ'লা ছিলেন। হযরত মোসলেহ মওউদ(রা.)এর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহাবী ছিলেন না। কিন্তু বড় পুন্যাত্মা,পবিত্র-আত্মা বুযূর্গ ছিলেন। তাঁর সাথে দেখা হওয়া আমার সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

২০০৬ সনেও কাদিয়ানে রমযানের রোযা এবং মসজিদে মোবারকে রোযার মাসের শেষের এতেকাফে অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ করেছি। তখনো মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের সাথে দেখা করেছি ও দোয়া নিয়েছি। তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন।

১৯৮৩ সনে একবার কাদিয়ান যাবার উদ্দেশ্যে দিল্লী পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন পাকিস্তানীদের জন্য বিশেষ ছাড়পত্র না নিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। দিল্লী সরকার তখন আমাদের অমৃতসর বা কাদিয়ান যাবার অনুমতি দেয়নি।

১লা মে ১৯৭৭ তারিখে আমরা ১৬ জন জামেয়া পাশ করে বেরিয়ে ওকালতে দিওয়ানে এসেছিলাম। তারপর ২/১ দিনে তখনকার নিয়মানুসারে হাদীকাতুল মুবাশ্বেরীনে আসলাম। আরো দু'একদিন পরে নাযের এসলাহ ও এরশাদ মোকামীর দফতরে আসলাম। তখন মোহতরম মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ আলী শাহ সাহেব নায়েব নাযের এসলাহ ও এরশাদ ছিলেন। তিনি একজন যোগ্য মোবাল্লেগ ছিলেন,

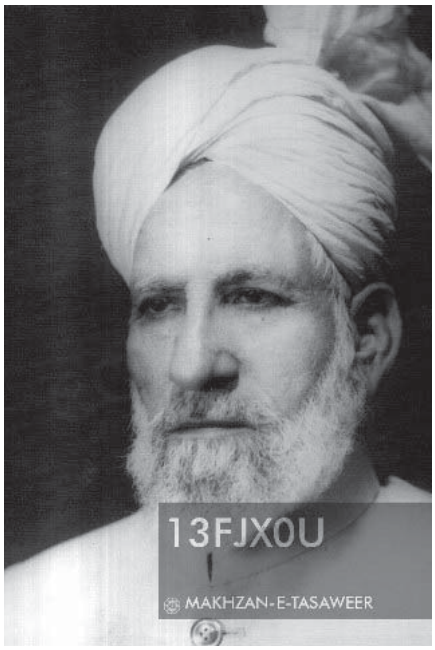

সুফি গোলাম মোহাম্মদ (রা.)

বক্তা এবং তর্কবাগীস ছিলেন। আমাদেরকে অনেক ভাল ভাল তালীম তরবীয়্যতি কথা শিখিয়েছিলেন।

শীঘ্রই আমাদের সকলের বিভিন্ন জামাতে মুরুব্বী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। আমরা সবাই নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে গেলাম। আমাকে জেলা সারগোদার একটি গ্রামে 'চক নং ৪৬ শিমালী' পাঠানো হল। তখন সেখানে কোন মুরুব্বী কোয়ার্টার ছিল না। বশির আহমদ সাহেবের বাড়ীর বাইরের একটি কক্ষে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

মোহতরম মির্যা আব্দুল হক মরহুম সারগোদা জেলা ও শহরের আমীর ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের প্রাদেশিক আমীরও ছিলেন। বড় জ্ঞানী ও বুযূর্গ ছিলেন। পেশাগত ভাবে ওকীল ছিলেন। হযরত মোসলেহ মওউদ(রা.) ১৯২২ সনে মজলিসে শূরার প্রচলন করেন। তখন বিভিন্ন বড় বড় জামাতে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। সেই শুরু থেকেই তিনি গুরুদাসপুরের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং মজলিশে শূরার মেম্বার ছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইন্তেকালের পর মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফত তথা পঞ্চম খলিফার নির্বাচনের সময়ও তিনি 'মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফত' অর্থাৎ খলিফা নির্বাচন কমিটির সদস্য ছিলেন। আমাদের জামাতী

হযরত চৌধুরী আলী মোহাম্মদ (রা.) বি.এ.বি.টি
বামে তাঁর নাতি আহমদ তারেক মাহমুদ যিনি বর্তমানে লর্ড অভ উইম্বলডন

নেযামের বিধি বিধান তিনি খুব ভাল জানতেন। আমি তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি। শুধু ঐ গ্রামের মুরুব্বী থাকার সময়ে নয় বরং পরবর্তীতেও বহুবার বহু সময়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছে। বহু কিছু জিনিস তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বই অনেক পড়তেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বইয়ের বিষয়ভিত্তিক সূচীপত্র প্রস্তুত করে প্রকাশ করেছিলেন। দশ বছর বিশেষভাবে কুরআন শরীফের তফসীর পড়েছেন। আমাকে তাঁর গবেষণা কর্ম দেখিয়েছিলেন। বেশ কিছু বই লিখেছেন।

(চলবে)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৭৫)

ভবিষ্যত সংক্রান্ত সংবাদে ব্যবহৃত রূপক বর্ণনা সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) বলেন:

* "খোদার চিরাচরিত রীতি হলো, প্রায়শঃ তাঁর ভবিষ্যত সংক্রান্ত সংবাদে রূপক কথায় সজ্জিত–সূক্ষ্মতত্ত্বের এমন কিছু অনুষঙ্গ থাকে, যার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে খোদাতা'লার নিয়মের অধীনে এ পরীক্ষার কারণে তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা ত্বরাপ্রবণতা বশতঃ খোদার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যবশত সেই ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে যাঁকে খোদা তা'লা স্বীয় জ্ঞান দান করেছেন। আর তারা খোদার ভয়ে ভীতদের মত চিন্তা করে না। এরপর যখন তাঁর নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত হয় আর তাঁর সত্যতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ প্রকাশ পায় তখন তারা হয় অনুশোচনার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা বিদ্বেষের গহ্বরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আর তাদের কাছ থেকে খোদা মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা, খোদা বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। আর যাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়েছে এবং খোদার পক্ষ থেকে আলোকিত করা হয়েছে এমন মানুষ ঐশী জ্ঞান চর্চায় দক্ষতা রাখেন আর প্রকৃত তত্ত্ব চিনেন, খোদার জ্যোতিতে দেখেন আর খোদার নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রিতদের মত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সৌভাগ্য পান।" (হামামাতুল বুশরা, পৃ–১২২)

* "প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কাশফ বা দিব্যদর্শন–শ্রেণীভুক্ত এবং সেই উৎস থেকে প্রস্ফুটিত, যা উপমামূলক ও রূপক ভাষায় রঙ্গীণ। নিজেদের স্বপ্নগুলোতে লক্ষ্য করুন, স্বপ্নে কোনো কিছুও কি সোজা–সিধাভাবে পরিদৃষ্ট হয়? হলেও তা অতি বিরলভাবে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, খোদা তা'লা কাশফ বা দিব্যদর্শন ও সত্যস্বপ্নগুলোও উপমা ও রূপকতার তত্ত্বপূর্ণ স্বর্গীয় পোষাকে সজ্জিত করে তাঁর নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত করে থাকেন।" ("ইযালায়ে আওহাম")

* "ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার দরুণ যাহারা রূপকের ভাষায় বর্ণিত ব্যাপার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণীই অস্বীকার করিতে হয়। ইহুদিদিগকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং খৃষ্টানদের এখন এই বিপদ ঘটিতেছে। সমুদয় লক্ষণ কখনও জনসাধারণের ধারণা অনুযায়ী পুর্ণ হয় না। এইরূপ হইলে নবীদের সময় মতভেদ হইবে কেন? তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করিবারই বা হেতু কি? ইহুদি জাতির নিকট জিজ্ঞাসা কর, মসীহ্ (আ.) আসিবার যাবতীয় নিদর্শন পূর্ণ হইয়াছে কি? তাহারা বলিবে পূর্ণ হয় নাই।" (তবলীগে হক, পৃ. ৪৫)

আহমদী মুসলমানের মতানুসারে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা:

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহ.) বলেন:

"আহমদী মুসলিম সম্প্রদায় যদিও মসীহ (আ.)-এর অবতরণ এবং মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে কোনভাবেই প্রত্যাখ্যান করে না, তবু তারা একটি বিষয়ের উপরে জোর দেয় যে, সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করাটা চরম সরলীকরণ মাত্র এবং তা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমরা আহমদী মুসলমানরা, বিশ্বাস করি যে, হযরত রসুলে আকরাম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সুউচ্চ মোকাম ও মর্যাদা পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণেই এরূপ মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। ভূল করা হয়েছে তাঁর গম্ভীর ও দার্শনিক বাণীর মর্ম বুঝতে। অনুরূপ কোন গুরুত্ববহ বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষেরা, প্রায় ক্ষেত্রেই রূপক ও উপমার ব্যবহার করে থাকেন যেগুলির গুঢ় অর্থ ভাসা–ভাসা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং দাজ্জাল ও তার গাধা সংক্রান্ত গোটা বিষয়টাই রূপক, আলংকারিক। এই বিষয়ে আহমদীয়া মুসলমানদের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

(১) আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ সেই ব্যক্তি নন যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল ইসরাঈলীদের মধ্যে। আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা মসীহ্ (আ.) ক্রুশের নির্যাতন ভোগের বহু পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মসীহ (আ.), প্রকৃত প্রস্তাবে, অন্য এক ব্যক্তি, যাঁর জন্মগ্রহণ করার কথা ছিল রসূলেপাক মুহাম্মদ

(সা.)-এর উম্মতের মধ্যে। ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সঙ্গে তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সাদৃশ্যের কারণে, তাঁকেও 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(২) 'ক্রশ' এর উল্লেখটাও রূপক বা উপমাসূচক। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আক্ষরিক অর্থে ক্রুশ ভঙ্গ করে বেড়াবেন না। তিনি শক্তিশালী যুক্তিতর্ক ও অকাট্য দলীলপ্রমাণ দিয়ে ক্রুশ ভিত্তিক খৃষ্টধর্মকে পরাস্ত করবেন। সুতরাং, 'ক্রশ' এর ধ্বংসসাধন হচ্ছে আদর্শগতভাবে খৃষ্টধর্মের উচ্ছেদসাধন।

(৩) 'শুকর' কাথাটাও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এই শব্দটি দিয়ে পাশ্চাত্য জগতের সাংস্কৃতিক নষ্টামী ও নোংরামীর কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে– যার দরুন মানুষ পরিণত হয়েছে পশুতে। আমেরিকা ও ইউরোপে যৌন অরাজকতার যে অবাধ লীলা বয়ে চলেছে, তাই প্রকাশ করা হয়েছে 'শুকর' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে। এর দ্বারা সেই অতিশয় জঘন্য লম্পটের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, মাসুম শিশুরা পর্যন্ত যার শিকারে পরিণত হচ্ছে। ঐ হাদীসে নিশ্চয় এ কথা বলা হয়নি যে, মসীহ্ (আ.) বন্য শুকরের পালগুলোর পিছনে পিছনে ধাওয়া করবেন এবং সেগুলিকে বার বার হত্যা করবেন। এই অহেতুক ও অস্বাভাবিক কাজের চিত্রটা খোদা তা'লার একজন নবীর জন্য নিতান্তই একটি উদ্ভট ও বিশ্রী ব্যাপার।...

(৪) 'ক্রশ' ও 'শুকর' এবং 'মসীহ' শব্দগুলির মত 'দাজ্জাল' শব্দটিও প্রতীক বা রূপক। দাজ্জাল হচ্ছে পার্থিব ক্ষেত্রে সেই বিরাট শক্তিশালী জাতির প্রতীক, যে জাতি কেবল পৃথিবীতেই শাসন চালানোর চেষ্টা করছে না, মহাশুন্যেও অভিযান দ্বারা শাসন চালানোর চেষ্টা করছে। ক্রুশ ও শুকর, বস্তুতঃ এই জাতীরই প্রতীক চিহ্ন। হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে, কিন্তু বাম চক্ষু হবে উজ্জ্বল ও বড়। এটাও রূপক বর্ণনা, যার প্রকৃত অর্থ–এই জাতিটার আধ্যাত্মিক চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে, কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টি হবে অত্যধিক প্রখর।...

(৫) শেষে আসে দাজ্জালের বিরাটাকায় গাধার কথা। আহমদী মুসলমানরা দাজ্জালের গাধাকেও মনে করে রূপক বা প্রতীকি। এই প্রতীকটির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছিল ভবিষ্যতের যানবাহন ব্যবস্থার কথা। এই গাধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দেয়া আছে, তার সবটাই, বিনা ব্যতিক্রমে, পাশ্চাত্যের আবিস্কৃত জ্বালানী–চালিত যানবাহনগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। এই গাধার যে বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা আছে,–তাতে আছে যে,এই গাধা আগুন খাবে, যমীনের উপরে চলবে, সাগর পাড়ি দেবে, বাতাসের উপর দিয়ে বিচরণ করবে। এই গাধা এত দ্রুত গতিতে চলবে যে, কয়েক মাসের রাস্তা কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করবে। লোকেরা তার পিঠের উপরে না চড়ে তার পেটের ভেতরে ভ্রমণ করবে, এবং তার পেটের মধ্যে বাতি জ্বলবে। সে তার যাত্রা শুরুর সময় ঘোষণা করবে এবং এর দ্বারা যাত্রীদেরকে তাদের আসন গ্রহণ করতে বলবে। ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এই বিষয়গুলোর বর্ণনাসমূহ আধুনিক কালের যানবাহনগুলোর দ্বারা এরূপ বিস্ময়কর ও সঠিকরূপে পূর্ণ হয়েছে যে, এতে হযরত রসূল পাক মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতাই সমুজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

(৬) "আহমদীয়া বিরোধীদের মতানুসারে অচিরেই একজন ঐশী পুরুষ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, এবং সাথে সাথে দিগ্বিজয়ের পথে সামরিক অভিযান শুরু করে দিবেন। তিনি শুকর বধ করবেন। ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল শক্তিকে পদানত করবেন। অতঃপর, তিনি অপেক্ষমান মুসলিম জনতাকে ইশারায় ডাক দিয়ে বলবেন: 'এসো হে আল্লাহর সৈনিকগণ! এসো ধার্মিকগণ! এসো এবং গ্রহণ করো পৃথিবীর রাজত্ব ও এই রাজদণ্ড।' এটাই হচ্ছে, মুসলিম রেনেসাঁর বা পুনর্জাগরণের যুদ্ধংদেহী মতবাদ। এ মতবাদকে আহমদী মুসলমানরা মনে করে ঘৃণার্হ ও পরিত্যাজ্য। তারা কোনক্রমেই এটাকে এর সাদামাটা শাব্দিক অর্থে সমর্থন করতে পারে না।"

(৭) "আহমদী মুসলমানদের ধারণা মতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত অন্যান্য ভবিস্যদ্বাণীগুলিও রূপক। যেমন তিনি যে সম্পদ বিতরণ করবেন মুসলমানদের মধ্যে, তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পদ, তা পার্থিব নয়। ...মানুষ তো কখনই পার্থিব সম্পদ লাভে পরিতৃপ্ত হয় না। বরং আরও পেতে চায়। কেবল মাত্র, আধ্যাত্মিক সম্পদকেই মানুষ অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।"

(৮) "ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত বিষয়গুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে এগুলো শাব্দিক অর্থে পূর্ণতার জন্য অপেক্ষমান অন্যান্য মুসলমান ফের্কাগুলো ইসলামী পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁর যে দর্শনে বিশ্বাস করে, ...যেমনটা আলোচনা করা হলো, ...এবং যা তারা প্রচার করে থাকে, আহমদীয়াত তাকে অযৌক্তিক ও বাতিল মনে করে। আহমদীয়াত মনে করে যে, এই প্রকারের দর্শন শুধু যে কুরআনী শিক্ষার প্রকৃত অভিপ্রায়ের পরিপন্থী তাই নয়, বরং তা নবীগণের ইতিহাসের সাথেও সামঞ্জস্যহীন। সর্বোপরি, এটা হযরত রসূলে আকরাম মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রদর্শিত আদর্শ এবং সুন্নাহরও ঘোর পরিপন্থী।" ('ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন' নামক পুস্তকের আলোকে)

(চলবে)

মুসলিম উম্মাহ্‌র সহমর্মিতায় সহজ-সরল এক নিবেদন

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌

(২য় কিস্তি)

নবী-রসূলগণের বিরোধিতা এক বাহ্যিক ও কৃত্রিম একতা সৃষ্টি করে

ধর্মের ইতিহাসে অভিনেবেশী দৃষ্টিপাত করলে, যে কেউ বুঝতে অপারগ হবে না যে, সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির জন্য সমস্ত নবী-রসূলগণকে যদিও অভিযুক্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়, কিন্তু আসলে তারাই সক্রিয় হয়ে ওঠেন এমন একটি সমাজকে একতাবদ্ধ করতে, যা তাদের আবির্ভাবকালে ক্রমবর্ধমান বিরূপ প্রবণতায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক থাকায় বহুবিধ দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ঈসা মসীহ (আ.) আবির্ভূত না হলে যুদ্ধেলিপ্ত ইহুদীদের দলগুলোকে একত্রিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিই ছিল না। সুতরাং, এটি ছিল শুধুমাত্রই যিশুর প্রতি ঘৃণা, যা মহান সেই অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করেছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল মূসা(আ.)-এর প্রেমেও যারা একতাবদ্ধ হতে পারে নাই, ঈসা মসীহের প্রতি শত্রুতা অকস্মাৎ তাদেরকে একসাথে এনে একত্রিত করে দিয়েছিল।

এটা মানুষের একত্রিত হওয়ার শুধু নেতিবাচক এক ভাবমাত্র, যা আল্লাহর নবীকে অমান্য ও অস্বীকারের কারণে হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে এই ধরনের বন্ধন বা কৃত্রিম একতা একটি ঝলক সৃষ্টি করতে পারলেও প্রকৃতপক্ষে এ এক জালিয়াতি বিশেষ। পরস্পরের মাঝে বিভেদের কারণে এই ধরনের মানুষ আসলে বিচ্ছিন্নই থাকে। এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন,

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝

অর্থাৎ- তারা তোমাদের সাথে কেবল দূর্গবেষ্টিত জনপদে অথবা প্রাচীরের আড়াল থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে। তাদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদ অতি ভয়ানক। তুমি তাদেরকে সংঘবদ্ধ মনে কর, কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে তারা বিভক্ত। এর কারণ হলো, তারা এমন এক জাতি, যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না। (সুরা আল হাশর-৫৯:১৫)

অতএব, তাদের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্ন থাকার অবধারিত এ নিয়তি পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

সত্যিকারের একতা নবী-রসূলগণই গড়েন

উপরোক্ত নেতিবাচক অর্থে মানুষের মাঝে লোক দেখানো ঐক্য প্রদর্শন করা নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য নয় বরং খোদাপ্রাপ্ত ঐ মহাপুরুষগণ মানুষের মাঝে এমন এক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ঐক্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন যার ইতিবাচক প্রভাব সমাজচিত্রের রূপ পাল্টে দিয়ে এক অনাবিল সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়, আর প্রকৃতপক্ষে তারা এ উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়ে থাকেন। শতধা-বিভক্ত চরম বিশৃংখল একটি সমাজে ঐক্যবদ্ধ এক উম্মাহ গঠণের প্রক্রিয়াটি রাতারাতি সংঘটিত হয় না। এজন্য চাই বেদনাঘন আত্মত্যাগের এক দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা।

এ প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, চিন্তাচেতনায় দ্বিধাবিভক্ত ঘৃণাপোষণকারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠিকে একমাত্র আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাঁর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত করেন।

মহানবী (সা.)এর যুগে সাহাবাগণের মাঝে অসাধারণ যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পদ্ধতি ও পথ-নির্দেশ উল্লেখে কুরআন করীমে বলা হয়েছে–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

অর্থাৎ- আর আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে, তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব তুমি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এরপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প করে ফেল, তখন আল্লাহর উপরই ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে 'ইমরান-৩:১৬০)

ইসলামী শক্তিসমূহের মধ্যে বিভাজন এবং বিদ্বেষ সৃষ্টিতে গুপ্তচরবৃত্তির মিথ্যা যে অপবাদ আহমদীয়াতের ওপর আরোপ করা হয়, পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিই এর অসারতা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন করেছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)এর দাবীর আগে থেকেই মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি ও অনৈক্য প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) 'ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ' হবার দাবী করার পূর্ব থেকেই মুসলমানদের মাঝে এই বিভক্তি আর দলবাজি চরম রূপ ধারণ করেছিল।

সমগ্র বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন শৈলীতে সমৃদ্ধ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই হচ্ছে আজ ঐশী আশীর্বাদপুষ্ট একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়, যার মাধ্যমে মহানবী(সা.) প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ও প্রেমময় সেই অটুট সম্পর্ক পুণরায় জগত আহমদীয়া খিলাফতের আশিসমণ্ডিত ধারায় প্রত্যক্ষ করে চলছে।

উপরের আলোচনা থেকে আবারও এটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হয়ে আবির্ভূত মহাপুরুষগণ যখনই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপরতা শুরু করেছেন, তখনই মানুষ অযথাই ধর্মীয় তত্ত্বগত বা প্রথাগত কোন পার্থক্য অথবা অন্যকোন কারণ দেখিয়ে, সর্বদা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সমষ্টিগতভাবে শত্রুতামুলক আচরণই করে এসেছে। তাই প্রামাণিক এমন সত্যকে পাশ কাটিয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা অনুসন্ধান না করে কেবলই উপেক্ষা করতে থাকাটা বিবেকবান কোন মানুষের জন্য আদৌ শোভনীয় নয়।

হীন উদ্দেশ্যে বিরোধী উলামার অপ্রাসঙ্গিক ও কাট-ছাঁট উদ্ধৃতি উপস্থাপন

আহমদীদের দাবী, তাদের ওপর আবোপিত এসব অপবাদ-অভিযোগ সত্য না'কি মিথ্যা, যাচাই করার সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উপায় হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার লেখা থেকে উদ্ধৃতি প্রদানকালে বিষয়বস্তু-সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের পুরো লেখাটি পাঠ করতে হবে। কেননা, আহমদীয়া বিরোধী উলামা সবসময়ই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর লেখাগুলো থেকে উদ্ধৃত প্রসঙ্গ উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু সত্য এটাই যে, বুদ্ধিমান বিজ্ঞজনেরা ধৈর্যের সাথে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সত্য অনুসন্ধানে রত হলে অবিলম্বে এই উপসংহারে পৌঁছে যান যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের লেখার তত্ত্বপূর্ণ গভীরতা তার নির্দোষ হওয়ার প্রমাণস্বরূপ এক জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী।

যে সব মিথ্যা অভিযোগ তার প্রতি আরোপিত হয়, এর পুরোটাই বায়বীয় আর সত্য এর সম্পূর্ণই বিপরীত। প্রাসঙ্গিক কিছু অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, আশা করি এ থেকে পাঠক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

"আমরা মুসলমান, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই।

যা কিছু আল্লাহ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল জানি। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং একবিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা যা কিছু পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা মর্ম নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" (নূর-উল-হক, ১ম পর্ব , রূহানী খাজায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ.- ৭)

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, সেটিই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এ কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা যা কিছু বলেছেন এবং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তৎসমুদয়ই সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এ ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত, তা পরিত্যাগ করে আর অবৈধকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সেব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলামদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (সা.)-এর উপর ঈমান রাখে আর এ ঈমান নিয়েই মরে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সব নবী আলাইহিমুস্ সালাম এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণীকে সত্য জানবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আর এর সাথে খোদাতা'লা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহ অবশ্য পালনীয় আর নিষিদ্ধ যাবতীয় বিষয়াদি পরিত্যাজ্য জ্ঞান করে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করবে। মোট কথা, যেসব বিষয়াদিকে আমল ও আকিদা রূপে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যেসব বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'ত সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দিয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উল্লিখিত ধর্ম-বিশ্বাস বিরোধী কোন দোষ আমাদের উপর চাপায়, সে তাক্‌ওয়া ও সত্যতা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে। কিয়ামত দিবসে তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, অন্তরে এসব অঙ্গীকার ধারন করা সত্ত্বেও আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

'আ'লা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন' অর্থাৎ- সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর কোপানল রয়েছে মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর।" (আইয়্যামুস সুলেহ্ , রূহানী খাজায়েন-১৪তম খণ্ড, পৃ.-৩২৩)

(চলবে)

‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

(৩য় কিস্তি)

নিজ হাতে কাজ করা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) ঘরের কোন কাজ করতে সংকোচ বোধ করতেন না। চারপাই বা খাট নিজেই লাগিয়ে নিতেন বিছানা-পত্র নিজেই বিছিয়ে নিতেন। কখনও যদি হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হত তখন ছোট বাচ্চারা চারপাইতে ঘুমিয়ে থাকলেও তিনি চারপাইয়ের একপাশে ধরতেন অন্যজন্য অপরপাশে ধরে আলতোভাবে বারান্দায় নিয়ে রাখতেন। কেউ যদি এমন পরিস্থিতিতে বা সকালে বাচ্চাদেরকে জোরে ডেকে উঠাতে চাইত তখন তিনি(আ.) তাদেরকে বারণ করে বলতেন, এভাবে হঠাৎ সজোরে ধাক্কা দিলে বা চিৎকার করলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। ধীরে ধীরে ডেকে তাদেরকে উঠাও। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯)

(২) কপুরথলা নিবাসী মিয়া ফাইয়ায আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস তার পবিত্র হাতে বাড়ির অভ্যন্তর থেকে খাবার নিয়ে এসে আমাদের সাথে বসে খাবার খেতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২৭)

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব মিসওয়াক করা খুবই পছন্দ করতেন। তিনি বাবলা গাছের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। অজুর সময় শুধু আঙ্গুল দিয়েই মিসওয়াক করে নিতেন। কয়েকবার আমাকে দিয়েও আনিয়েছেন আমি ছাড়া অন্যান্য খাদেমদের দ্বারাও আনাতেন। তিনি(আ.) কখনও কখনও নামায ও অজু ছাড়াও মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৯)

(২) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) পরিধেয় কাপড়ের ঘ্রাণ নিয়ে দেখেছি। আমি কখনোই কোন কাপড়ে ঘামের দুর্গন্ধ পাই নি। (অর্থাৎ তিনি অসাধারণভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার প্রতি খেয়াল রাখতেন)। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২৬)

(৩) কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বাড়িতে যখনই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে টয়লেটে যেতেন তখন নিজের সাথে অবশ্যই লুটা নিয়ে যেতেন। শুধু তাই নয় তিনি টয়লেটেরে ভিতরে থেকে হাত পরিস্কার করে আসলেও বাইরে এসে আবার ভালো করে হাত পরিস্কার করতেন। এছাড়াও হযরত মির্যা বশীর আহমদ এমএ(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেবের রীতি ছিল, পবিত্র হয়ে বাইরে এসে একবার পরিস্কার পানি দিয়ে হাত ধুতেন এরপর হাতে মাটি ঘষে পুনরায় হাত পরিস্কার করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮১)

সরলতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, আমি পচিশ বছর ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) অভ্যাস, চাল-চলন এবং জীবনাদর্শকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষনের সুযোগ পেয়েছি। গৃহাভ্যন্তরেও এবং ঘরের বাইরেও আমার সারা জীবনে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) ছাড়া আর কাউকে এমন অকৃত্রিম গুণাবলীর অধিকারী দেখি নি। হুযূরের কোন কথা, কাজ, উঠা-বসা কোন কিছুতে কৃত্রিমতার গন্ধও আমি অনুভব করি নি। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩০)

(২) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) কখনও কখনও ঘরে খালি পায়ে পায়চারি করতেন। বিশেষভাবে যদি শক্ত কার্পেট বিছানো থাকতো তাহলে তিনি খালি পায়ে পায়চারি করতেন এবং লেখালেখির কাজও করতে থাকতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১৯)

(৩) মুন্সি আব্দুল আযীয(রা.) বর্ণনা করেন, একদা... হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, আজ আমরা বাগানের দিকে ঘুরতে যাবো। অতঃপর তখনই বেরিয়ে গেলেন। বাগানে দু'টি খাট বিছানো ছিল। বাগানের পরিচারক দু'টি বড় টুকরি ভরে তুঁত ফল হুযূরের সামনে রেখে দিল। হুযুরের ভক্তরা খাটে বসে গেল আর এই পরিবেশটি এমনই অকৃত্রিম ছিল যে, হুযূর পায়ার দিকে বসে ছিলেন আর অন্যরা খাটিয়ায় বসে তুঁত খাচ্ছিল। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একদিন প্রচণ্ড গরমের সময়ে দুপুরের সময় কিছু বন্ধু হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ভেতরে আসল যেখানে হুযূর লেখালেখির কাজে রত ছিলেন। সেই কক্ষে কোন পাখাও ছিল না। কতিপয় ভক্ত নিবেদন করল, হুযূর কমপক্ষে পাখা লাগিয়ে নিন যেন গরমের সময় একটু স্বস্তি হয়। হুযূর বললেন, তখন যেখা যাবে মানুষের ঘুম আসবে আর কাজ করতে পারবে না। আমি তো এমন স্থানে কাজ করতে চাই যেখানে গরমে মানুষের তেল বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭)

(৫) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) যখন কয়েকজন অনুসারীকে সাথে নিয়ে বাবা গুরু নানকের চোলা দেখার জন্য ডেরা বাবা নানকে গেলেন তখন সেখানে একটি বড়ই গাছের নিচে কাপড় বিছিয়ে হুযূর ও জামাতের সদস্যবৃন্দ বসে গেলেন। সফর সঙ্গী হিসাবে মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবও ছিলেন। গ্রামের লোকেরা হুযূরের কথা শুনে সেখানে একত্র হতে লাগল। এদের মাঝে যারা প্রথমে এসেছে

তাদের কতিপয় লোক মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবকে মসীহ্ মাওউদ ভেবে তার সাথে করমর্দন করে বসে পড়ে। তিন চার জনের করমর্দন করার পর বুঝা গেল কোন ভুল বুঝা বুঝি হচ্ছে। এরপর যে-ই মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সাথে করমর্দনের জন্য আসত তিনি হুযূরের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিতেন, ইনি হলেন প্রতিশ্রুত মসীহ(আ.)। (সীরাতুর মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯৭)

নোট: কখনও কখনও মহানবী(সা.)-এর বৈঠকেও এমন ভুল বুঝা-বুঝির উদ্রেক হত। নবীদের বৈঠক যেহেতু একেবারে সাধারণ এবং সব ধরনের কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র থাকে এবং সবাই ভালোবাসার সাথে একসাথে বসে থাকে তাই অচেনা কেউ কখনও কখনও সাময়িক দ্বিধার শিকার হয়ে যান।

(৬) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, সেসব পুস্তক যা সর্বদাই হযরত সাহেবের দৃষ্টির সামনে থাকত, এছাড়া লেখালেখির সকল কাগজপত্র বাস্তার মাঝে বেঁধে রাখা হত। কোন কোন সময় তিন বস্তা কাগজও জামা হয়ে পড়ত আর সাধারণত দুই বস্তা তো থাকতোই। এসব বস্তা সেলাই করা ছিল না। বরং চারকোণা কাপড়ের মাঝে কাগজ বা পুস্তকাদি রেখে উভয় দিক থেকে গিট দিয়ে দিতেন। আর লেখা লেখির সময় তার বিছানাই তাঁর অফিসে পরিণত হত। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৭)

আচরণ

নবীরা আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া ছাড়াও জাগতিক অনেক গুণাবলীর অধিকারীও হয়ে থাকেন। মোটকথা তারা সকল ক্ষেত্রে নিজ অনুসারীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকেন। এসব গুণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল, রসিকতার গুণ। আর এর কারণে মানুষের মাঝে একটি প্রাণচাঞ্চল্যতা বিদ্যমান থাকে। তার মন-মস্তিষ্কে এক প্রফুল্লতা বিরাজ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 'কানা রাসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ইউমাযেহু ওয়া লা ইয়াকূলু ইল্লাল হাক্কা' অর্থাৎ নবী করিম (সা.)-ও রসিকতা করতেন কিন্তু রসিকায় সবসময় সত্য কথাই বলতেন, শালিনতাকে কোনক্রমেই বিসর্জন দিয়ে হাসি ঠাট্টা করতেন না। হযতর মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনিতেও আমরা হাসি, উৎফুল্লতা, রসিকতার উদাহরণ দেখতে পাই। যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল:

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, কখনও কখনও হুযর(আ.) কোন হাসির কথায় হাসতেন আর খুব হাসতেন। আমি দেখেছি, হাসির কারণে তাঁর চোখে পানি চলে আসত যে পানি তিনি আঙ্গুল বা কাপড় দিয়ে মুছে নিতেন। কিন্তু তিনি কখনও কোন আজে বাজে কথা বা হাসি তামাশামূলক কথায় হাসতেন না বরং এমন কোন কথা যদি কেউ বলত তিনি তাকে বারণ করে দিতেন। আমি একবার ঠাট্টামূলক কোন বাক্য কারো বরাতে বলেছি তখন তিনি কাছেই চারপাই-তে শুয়ে ছিলেন, তিনি হুঁ হুঁ কওে নিষেধ করতে করতে উঠে বসে পড়লেন এবং বললেন, এটি গুনাহর কাজ। (সীরাতুল মাহদী: তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

(২) হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন আহমদ এম এ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তখনও বালকই ছিলাম, একবার আমাদেও আম্মা অর্থাৎ হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) রসিকতা করে কিছু পাঞ্জাবী বাক্য বলে সেগুলোর উর্দূ সমার্থক শব্দ জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তখন আমি মনে করতাম, কোন শব্দকে একটু দীর্ঘ করলেই বুঝি উর্দূ হয়ে যায়। স্বরচিত এই নিয়মানুযায়ী আমি যখন উল্টা পাল্টা উত্তর দিতাম তখন আম্মা খুবই হাসতেন এবং আমার পিতাও পাশে দাঁড়িয়ে হাসতেন। তেমনিভাবে হযরত সাহেবও দু' একটি পাঞ্জাবী শব্দ বলে সেগুলোর উর্দূ জিজ্ঞেস করে। এরপর আমার উত্তর শুনে তিনি খুব হাসেন। আমার মনে আছে, তখন আমি 'কুত্তা' শব্দের উর্দূ 'কূতা' বলেছিলাম আর এই উত্তর শুনে হযরত সাহেব অনেক হেসেছিলেন। (সীরাতুল মাহদী: তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

(৩) হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) খুবই উৎফুল্ল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। কখনও কখনও নিজে থেকেই কৌতুক করা শুরু করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

(৪) হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন আহমদ এম এ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর জীবদ্দশায় আমাদের বাড়িতে একজন মহিলা সেবিকা ছিল, তার নাম ছিল মেহরু। সেই বেচারী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত এবং যেসব শব্দ খানিকটা উচুঁ সমাজে ব্যবহার হত সেগুলো বুঝত না। একবার হযরত সাহেব তাকে বললেন, একটি খিলাল নিয়ে আস। সেই মহিলা দ্রুত ছুটে গেল এবং ঔষধ বাটার পাথরের পুতা নিয়ে আসল; এটি দেখে হযরত সাহেব খুবই হাসেন এবং হাসতে হাসতে আমার মা হযরত উম্মুল মোমেনীনকে বললেন, দেখ, আমি খিলাল চেয়েছি আর সে কী নিয়ে এসেছে! এই মহিলারই আরেকটি ঘটনা রয়েছে, একবার লিপিকার মিঞা গোলাম মুহাম্মদ অমরিতসরী দরজারয় কড়া নেড়ে বললেন, হযরত সাহেবকে বল 'কাতেব' অর্থাৎ লিপিকার এসে গেছে। এই সংবাদ নিয়ে সে হযরত সাহেবের কাছে গেল এবং বলল, হুযূর 'কাতেল' অর্থাৎ হত্যাকারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আর আপনাকে ডাকছে। হযরত সাহেব এটি শুনে খুবই হাসেন।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

(৫) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) কখনও কখনও সন্তাদের সাথেও খুনটুসি বা মজা করতেন। যেমন কোন বাচ্চার পাজামার নিচের অংশ ধরে রেখে চুপ করে থাকতেন। আবার বাচ্চা যদি শুয়ে থাকত তখন হঠাৎ এসে পা ধরে পায়ের তালুতে কুতকুতি দিতেন। (হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন আহমদ এম.এ. (রা.) বর্ণনা করেন, এই যে পাজামার শেষ মাথা ধরে চুপ করে থাকতেন– এই ঘটনা আমার সাথেও ঘটেছে।) (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১)

(৬) হাফেজ নূর মুহাম্মদ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি এবং হাফেজ নবী বখশ সাহেব যখন হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলাম তখন এশার নামাজের পর হযরত সাহেব মুচকি হেসে হাফেজ নবী বখশ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, মিঞা নবী বখশ আপনি কোথায় শোবেন? মিঞা নূর মুহাম্মদ তো কবরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে!" আসল কথা হল, তখন আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম আমার ঠিক নিচেই একটি বেণুবাঁশ পড়ে ছিল। এটি দেখে হযরত সাহেব কৌতুক করে এমনটি বলেছেন। কেননা প্রচলিত আছে, মৃত ব্যক্তিকে বেণুবাঁশ দিয়ে মেপে সে হিসাবে কবর প্রস্তুত করা হয়।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭)

(চলবে)

সংবাদ

মিরপুরে সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২রা ডিসেম্বর, ২০১৭ শনিবার বাদ আসর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর এর উদ্যোগে "সিরাতুন্নবী (সা:) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর এর ভারপ্রাপ্ত আমীর মোহতরম মোহাম্মদ গোলাম কাদের। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফালাহ্ উদ্দিন সাদেক। "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর উত্তম জীবন আদর্শ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। মাগরীব ও এশার নামায নামাজের বিরতির পর পুনরায় সভার কাজ শুরু হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন ও আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন ও মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ, মুরুব্বী সিলসিলা।

সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনারে এমটিএতে সরাসরি সম্প্রচারিত 'সত্যের সন্ধানে' প্রোগ্রাম দেখানো হয় এবং উপস্থিত অংশগ্রহনকারীগন এতে প্রশ্ন করেন। সেমিনার রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্যাপী চলে। সেমিনারে ১৪০ জন মেহমান (জেরে তবলীগ) সহ ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকলের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

মোহাম্মদ মামুনুল হক, সেক্রেটারী তবলীগ

গাজীপুর জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/১১/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুর এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব এর সভাপতিত্বে এবং বিশেষ অতিথি মোয়াল্লেম সাহেবের উপস্থিতিতে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। এরপর নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব শেখ আল্ মাহমুদ সাহেব, আতিকুর রহমান, জনাব জায়েদুল কাদের, আশরাফুল ইসলাম (রাজু) কবির আহমদ এবং খাতামান্নাবীঈন (আ.) এর ওপর বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ, গাজীপুর। সভাপতির বক্তব্য প্রদান শেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নও মোবাঈন ৬ জন এবং জেরে তবলীগ ৫ জনসহ মোট ৮৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৬-১০-২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ)। প্রথমে কুরআন পাঠ করেন রিপা, হাদীস পাঠ করেন সাদেকা বেগম, নযম পাঠ করেন আমাতুস সামী। নারীজাতির প্রতি রসূল পাক (সা.)-এর উত্তম আচরণ সম্পর্কে বলেন বিলকিস তাহের। এবং প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বলেন সেলিনা খোকা। এরপর নামায ও হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সম্পর্কে বলেন আমাতুস সামী। দরূদ শরীফের ফজিলত ও হযরত ইমাম মাহ্দীর আগমন সম্পর্কে বলেন, আফরোজা মতিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১২ জন অ-আহমদী বোন সহ মোট ২৯ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

তেজগাঁ জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে ৮৬, মনিপুরী পাড়ায় এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মোহতরমা তারিন ইসলাম। এরপর

হাদীস পাঠ করেন সায়রা ওয়াদুদ। তারপর রসূল করীম (সা.) এর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন মাহমুদা আকতার খান। নযম পরিবেশন করেন নাসেরাত নাফিসা মালিয়াত তাবিয়া।

সীরাতুন নবী জলসার পেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন তারিন ইসলাম। সবশেষে আলোচনা করেন মহানবী (সা.) এর শৈশবকাল সম্বন্ধে আরিফা রহমান। সমাগত অতিথিদের মাঝে সমাপনী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা রোকেয়া মোমেন সাহেবা। অতিথিদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোহতরমা লায়লা নার্গিস। এতে মোট ২৫ জন লাজনা সদস্যা উপস্থিত ছিল।

লায়লা নার্গিস

কটিয়াদী জামাতের উদ্যোগে তালিমুল কুরআন ও জিরয়াত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/১২/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার কেন্দ্র থেকে আগত প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী আগমন উপলক্ষে কটিয়াদীর প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ, হান্নান সাহেবের সভাপতির মাধ্যমে উক্ত আলোচনায় সভার কাজ আরম্ভ হয়। আলোচনায় প্রথমেই কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মান্নান সাহেব। সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমেই কেন্দ্র থেকে আগত প্রধান অতিথি জনাব ফজল-ই-ইলাহী সাহেব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ওপর ও ইহার গুরুত্বের ওপর আলোচনা করেন ও জিরয়াত বা কৃষি বিভাগের বিষয়ে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সভার শেষে এ্যাডভোকেট জনাব আজিজুল হক সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন জামাত হতে আগত আনসার, খোদ্দাম ও লাজনা ভাই ও বোনেরা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সবাই শ্রবণ করেন। উল্লেখ থাকে যে, বিভিন্ন জামাত থেকে আগত মেহমান ও নও মোবাঈন সহ মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

সুন্দরবন জামা'তে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের উদ্যোগে গত ১৮/১১/২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার মজলিস আমেলার সকল সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাহাবুবুর রহমান এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব আব্দুস সামাদ সাহেব। দিনব্যাপী কর্মশালা সকাল ৯ টায় জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব এম রাফিকুল ইসলাম। সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে কর্মশালার কাজ শুরু হয়। কর্মশালায় স্থানীয় আমীর সহ সকল আমেলার সদস্যদের স্ব-স্ব কাজের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অবহিত করানো হয়। মজলিসে আমেলার সকল সদস্য হালকা প্রেসিডেন্টগণ সহ সর্বমোট ৩৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে ১ ঘন্টা নামায ও খাওয়ার বিরতি বাদে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত কর্মশালার কার্যক্রম চলে। সবশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কাজ সমাপ্ত হয়।

গাজী মিজানুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৯/১১/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে শাকোয়া বানুরহাটে তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীস পাঠ করেন বিলকিস তাহের। বয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, আমাতুস সামী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বলেন আফরোজা মতিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। সূরা ফতেহার মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেন, নাছিমা বশির, (মোফাত্তিস, বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল)। সবশেষে জেরে তবলিগ বোনদের প্রশ্ন/উত্তর ও পরে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এ অনুষ্ঠানে ২ জন জেরে তবলিগ বোন বয়াত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ্ উক্ত তবলিগী অনুষ্ঠানে ১৬ জন জেরে তবলিগ ও ৫ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৯/১১/২০১৭ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমনগরের উদ্যোগে শাকোয়া বানুর হাটে দিনব্যাপী নও মোবাঈনগণের সমন্বয়ে সেমিনার করা হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর বয়াতের শর্ত ও নও মোবাঈনদের অবশ্যকরণীয় সম্পর্কে বলেন মিলা পাটোয়ারী, চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, বিলকিস তাহের, নমায ও পর্দা সম্পর্কে বলেন, আফরোজা

মতিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত সেমিনারে ১৬ জন জেরে তবলিগ ও ৫ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/১১/২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগ এর উদ্যোগে এক তরবীয়তী সভার আয়োজন করা হয়। জনাব হযরত আলী সাহেবের বাসায় উক্ত তরবিয়তী সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল কাদের, সেক্রেটারী তরবিয়ত আ.মু.জা. রঘুনাথপুর বাগ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আকরাম, অনুবাদ: মোহাম্মদ আকাশ, নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ সজিব। তরবিয়তী বক্তৃতা করেন জনাব সোহেল আহমদ, কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জনাব এস. এম. মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। উক্ত তরবিয়তী সভায় ৪ জন নওমোবাঈন সহ ৩৩ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

গত ০৪/১২/২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগ এর উদ্যোগে মোহতরমা তাসলিমা বেগম সাহেবার বাড়ীতে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব অহিদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আকরাম আহমদ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব সজিব আহমদ। নামাযের গুরুত্ব এবং আর্থিক কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা দেন জনাব জাহিদ হাসান (আব্দুল্লাহ্) এবং জনাব এস. এম. মাহমুদুল হক মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। উক্ত সভায় ৩৩ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস. এম. মাহমুদুল হক

মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের চট্টগ্রাম আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান সাহেব গত ১২ অক্টোবর, ২০১৭ ইং রোজ- বৃহস্পতিবার সকাল ০৯.২৫ ঘটিকায় ঢাকাস্থ ইউনাইটেড হাসাপাতালে-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। একই দিন ঢাকার ৪নং বকশি বাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে বাংলাদেশর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ইমামতিতে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন আর্থাৎ ১৩ অক্টোবর, রোজ- শুক্রবার, ১১ ঘটিকায় চট্টগ্রামের ষোলশহরস্থ মরহুমের নিজ বাস ভবনের সামনে দ্বিতীয় নামাজে যানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয় ও শেষ জানাযা চকবাজারস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে বাংলাদেশ পুলিশের একটি চৌকশ দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এর পর যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের এশিয়ান হাইওয়ে অবস্থিত কবরস্থানে মরহুমের দাফন সুসম্পন্ন হয়।

মরহুমের জানাজা এবং দাফনে চট্টগ্রামের আহমদী ও স্থানীয় বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও মরহুমের সহযোদ্ধা ভাইয়েরা অংশ গ্রহণ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান সাহেব নিয়মিত একাধারে তবলীগকারী, অসম্ভব ধৈর্যশীল, সুন্দর সাহসিকতার মানুষ এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে আর্থিক কোরবানির ক্ষেত্রে সবসময় প্রথম সারিতে থাকার চেষ্টা করতেন।

আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ তা'লা যেন মরহুমকে বেহেস্তের উচ্চ মোকাম ও পরিবারবর্গকে সবরে জামিল দান করেন।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্য মরহুম মহব্বত আলী সাহেব দীর্ঘ দিন জঠিল রোগে আক্রান্ত হয়ে, গত ০৩ নভেম্বর, ২০১৭ ইং রোজ- শুক্রবার আনুমানিক রাত ০৬.০০ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র সন্তান রেখে যান।

মরহুমের জানাজা এবং দাফনে আহমদী ও স্থানীয় বহু গণ্যমাণ্য গয়ের আহমদী ভাইয়েরা অংশ গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মরহুম মহব্বত আলী সাহেব অসম্ভব ধৈর্যশীল, নিঃঅহঙ্কার, ব্যক্তি ছিলেন। চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিভিন্ন সংগঠনের সেবামূলক কাজে সবসময় প্রথম সারিতে থাকার চেষ্টা করতেন। আমরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ তায়ালা যেন মরহুমকে বেহেস্তের উচ্চ মোকাম ও পরিবারবর্গকে সবরে জামিল দান করেন।

খালিদ আহাম্মদ সিরাজী

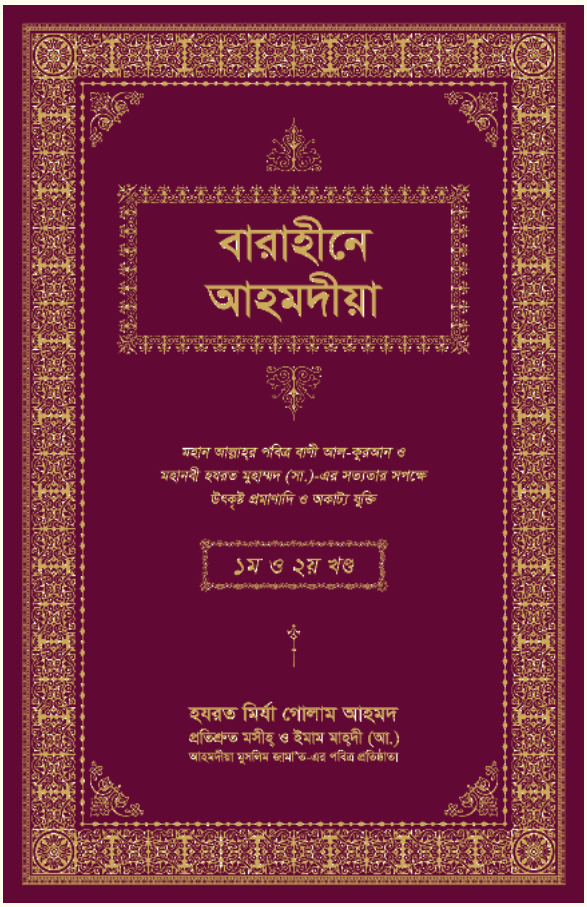

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

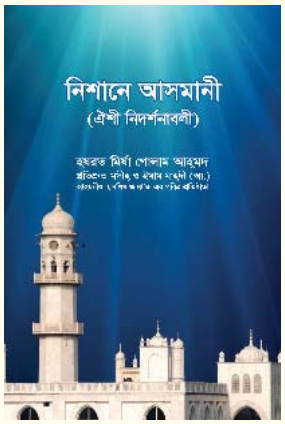

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

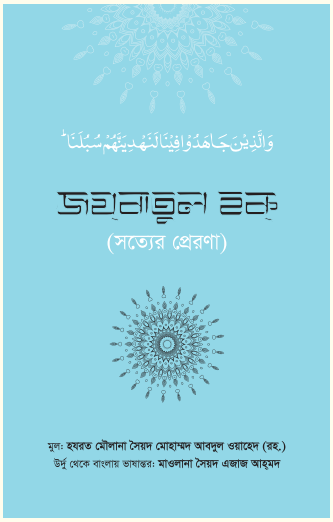

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির বিক্রয়মূল্য ২০/- মাত্র।

New Vol. No. 80 | 11th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th December, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com